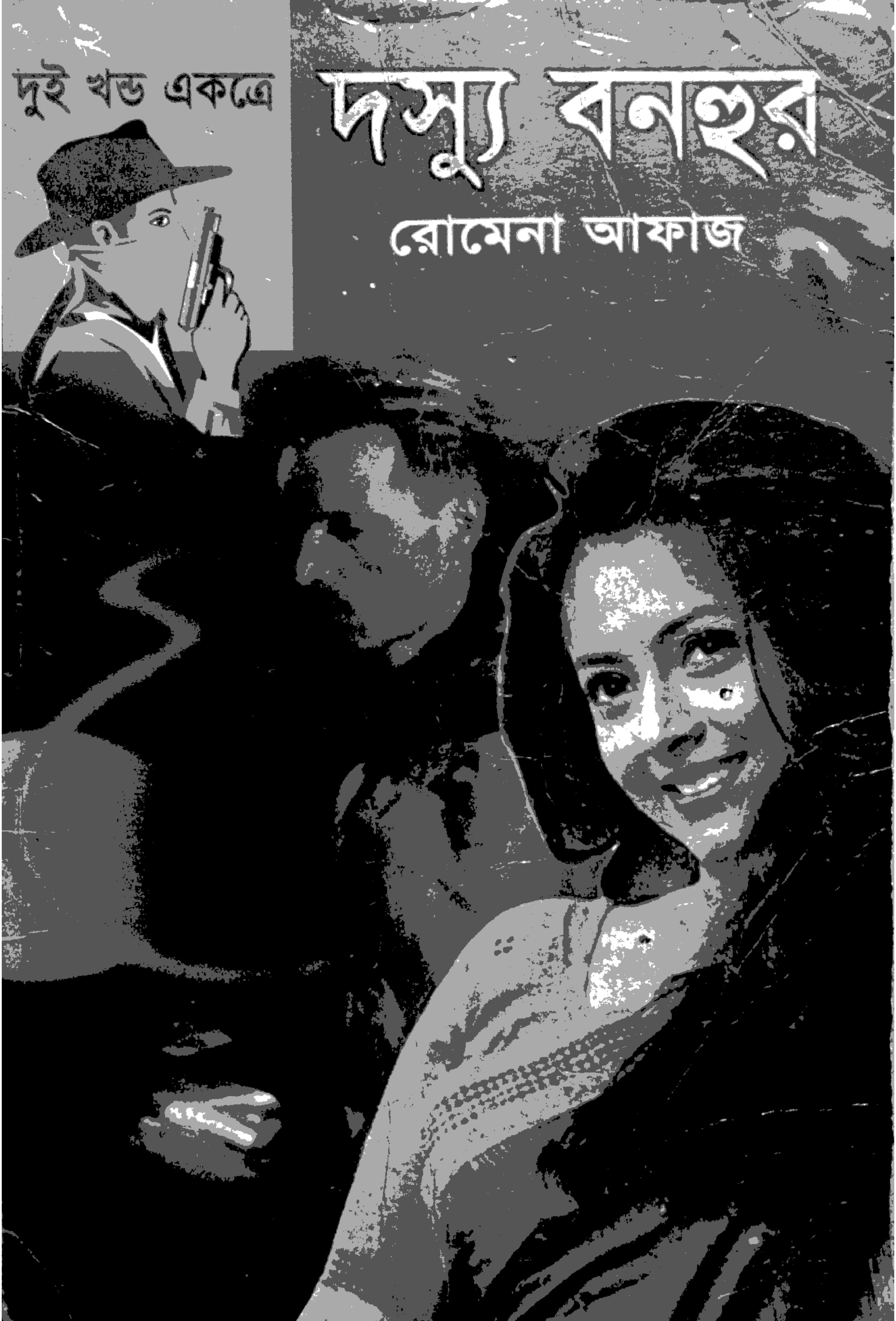
দুই খন্ড একত্রে
দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

এ, এইচ, এম, মুহিত
বই লাভারস পোলাপান

দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসী প্রকম্পমান। পথে-ঘাটে-মাঠে শুধু ঐ এক কথা—দস্যু বনহুর—দস্যু বনহুর! কখন যে কোথায় কার ওপর হানা দিয়ে বসবে কে জানে!

ধনীরা তো সব সময় আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ভয়ই বেশি। দস্যু বনহুরের জন্য কারও মনে শান্তি নেই। দস্যু বনহুর যে কে, কেমন তার আসল রূপ, তা কেউ জানে না। কোথা থেকে আসে সে, কোথায় চলে যায়, তাও কেউ বুঝতে পারে না। গভীর রাতে জমকালো একটা অশ্বপৃষ্ঠে দেখা যায় তাকে। গোটা শরীরে তার কালো পোশাক। মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি। মুখে একটা কালো রুমাল জড়ানো। কোমরের বেল্টে গুলিভরা রিভালবার। বিশেষতঃ অন্ধকার রাতেই বনহুর হানা দেয়। শহরে-বন্দরে, গ্রামে, পথে-ঘাটে-মাঠে সব জায়গায় হয় তার আবির্ভাব।

বনহুরের নামে মানুষ যতই আতঙ্কিত হউক না কেন, আদতে বনহুর ছিল অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ। মনও ছিল তার উদার—মহৎ। দস্যুবৃত্তি বনহুরের পেশা নয়—নেশা। খেয়ালের বশে সে দস্যুতা করত। দস্যুতায় বনহুর আনন্দ পেত।

হয়তো এক ধনীর বাড়িতে হানা দিয়ে তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে বিলিয়ে দিত সে দীন-হীন গরীবদের মধ্যে। নয় ফেলে দিত সাগরের জলে। অদ্ভুত ছিল বনহুরের চালচলন। বনহুরের প্রাণ ছিল যেমন কোমল, তেমনি কঠিন।

বনহুরের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার অশ্ব তাজ। যেখানে যেত বনহুর, তাজ হত তার সঙ্গী। নিজ হাতে সে তাজকে ছোলা খাওয়াতো, গা ঘষে দিত, এমন কি তাজ যখন ঘাস খেত, বনহুর পাশে বশে খেত রুটি আর মাংস। মাঠে যখন চরতো, বনহুর বসে থাকতো তার পাশে। হয়ত শিস দিয়ে খাস খাওয়াতো।

তাজও তেমনি ভালবাসতো বনহুরকে। বনহুরের ইঙ্গিত তাজ বুঝতো। তাজ ছিল অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান অশ্ব। তার গতিও ছিল উল্কার মত দ্রুত। অন্ধকারেও তাজ কোনদিন পথ হারাতো না।

দস্যুতা করতে গিয়ে অনেক সময় বনহুর তাজকে বাইরে রেখে প্রবেশ করতো অন্দরবাড়িতে। হয়ত ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বনহুরকে অন্য পথে

প্রাচীর টপ্‌কে পালাতে হত। বনহুর শুধু একটি শিস দিত, সঙ্গে সঙ্গে তাজ গিয়ে হাজির হত তার পাশে। বনহুর প্রাচীরের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তো তাজের পিঠে। তারপর আর কে পায় তাকে!

তাজের লাগাম ছিল না! বনহুর তাজের কাঁধের কেশ ধরে উবু হয়ে থাকে, তাজ ছুটতো হাওয়ার বেগে।

❑

তাজের পিঠে ছুটে চলেছে বনহুর।

প্রান্তরের বুক চিরে গহন বনে প্রবেশ করলো বনহুরের অশ্ব। এবার তার গতি কিছুটা মন্থর হয়ে এলো। গহন বনের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ ধরে ছুটতে লাগলো তাজ। ভোরের আলো তখন গহন বনকে অনেকটা হাল্কা করে এনেছে।

বনের মধ্যে বহুকালের পুরানো এক রাজপ্রাসাদ। কালের কঠোর নিষ্পেষণে আজ সে প্রাসাদ শুধু ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। এককালে সেখানে যে বিরাট এক রাজবাড়ি ছিল অনুমানে তা বুঝা যায়। আজ সে প্রাসাদের গায়ে বিরাট বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মেছে। আগাছায় ভরে উঠেছে প্রাসাদের অন্তপুর। সেটা যেন ঐ ভগ্নপ্রাসাদের নিকটে এসে আরও ঘন হয়েছে।

বনটা ছিল শহর ছেড়ে অনেক দূরে। তাই কোন লোকজন এ বনে কোনদিন প্রবেশ করত না। শিকারীরা মাঝে মাঝে শিকারে আসত বটে, কিন্তু তারা বনের খুব ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেত না। কাজেই ভগ্নপ্রাসাদটি ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সেই ভগ্নপ্রাসাদের সম্মুখে এসে বনহুরের অশ্ব থেমে ছিল। লাফিয়ে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক এসে তাজকে ধরল। বনহুর ভগ্নপ্রাসাদের একটা দরজা লক্ষ্য করে এগুতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করল বনহুর, অমনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে তখন দেখলে মনে হবে, যেন একটা পাথরখণ্ড বা একটা মরচে ধরা লৌহপাত।

বনহুর দরজার ওপাশে পৌঁছতেই দু'জন সশস্ত্র দস্যু সসম্মানে সরে দাঁড়ালো।

বাইরে থেকে রাজপ্রাসাদটাকে ভগ্নস্তূপ বলে মনে হলেও আদতে ভিতরটা তার ভগ্নস্তূপ ছিল না। সুন্দর ঝক্‌ঝকে একটা রাজবাড়ি বলেই মনে হত। বাড়ির ভিতরের পথগুলো সাদা মার্বেল পাথরে গাঁথা। উঠানে সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা, তার চারপাশে ফুলের বাগান।

বনহুর সে পথ ধরে সোজা এগিয়ে চলল। কিছুদূর এগুতেই সম্মুখে বিরাট বাঘের মুখের আকারে পাথরের মুখ হা করে রয়েছে। বনহুর বাঘের একটা দাঁতে পা দিয়ে চাপ দিতেই বাঘের জিভটা ভিতরে ঢুকে গেল, সেখানে দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ পথ, সে সুড়ঙ্গপথে দ্রুত এগিয়ে চলল সে।

মাটির নিচে রাজপ্রাসাদের মত আর একটা বাড়ি। পাশাপাশি কয়েকটা কক্ষ। প্রত্যেক কক্ষে বেলওয়ারী ঝাড় ঝুলছে। ঝাড়ের মধ্যে অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে।

মাঝখানের বড় একটা কক্ষে এক বৃদ্ধ শায়িত। শয্যাশায়িত ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, তবু তার চেহারা বলিষ্ঠ। মস্তবড় গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে বালা। হাতে বালা। লোকটা অসুস্থ, মাঝে মাঝে সে কোঁকিয়ে উঠছিল। চোখের রঙ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। মাংসপেশীগুলো যদিও শিথিল হয়ে এসেছে, তবু দেখলে বুঝা যায়, এককালে তার শরীরে ছিল অসীম শক্তি। শয্যাশায়িত বৃদ্ধ দস্যু কালু খাঁ।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করলো।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো কালুখাঁ—কে, বনহুর?

হ্যাঁ বাপু। এগিয়ে এলো সে কালু খাঁর পাশে।

কালু খাঁ হাত দিয়ে নিজের বিছানায় একটা অংশ দেখিয়ে বলেন—বস্ বাছা।

বনহুর বসে ছিল কালু খাঁর পাশে, বৃদ্ধের একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে বলেন—বাপু, এখন তোমার কেমন লাগছে?

বৃদ্ধ ঘোলাটে চোখে বনহুরকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করে বলেন—বনহুর, আমি আর বাঁচবো না।

বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে— বাপু, আমি তোমার জন্য ভাল ডাক্তার নিয়ে আসব।

না বনহুর, ডাক্তারের আর প্রয়োজন হবে না। একটু থেমে পুনরায় ডাকে কালু খাঁ—বনহুর।

বল বাপু।

বৃদ্ধ কালু খাঁ ভয়ানক হাঁফাচ্ছিল! ঘেমে নেয়ে উঠেছে তার সমস্ত শরীর, অতি কষ্টে বলে সে—বনহুর, আজ বিদায়ের দিনে তোকে একটা কথা বলবো, যা এতদিন বলি বলি করেও বলা হয়নি।

বাপু, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, আমি সব শুনবো।

না না, তা হবে না, আজ না বললে হয়ত আর কোনদিন বলা হবে না।

বনহুর কালু খাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—বাপু, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না রে না, কোন কষ্ট হচ্ছে না। বনহুর, একটু পানি দে দেখি বাছা।

বনহুর পাশের সোরাহী থেকে এক গেলাস পানি এনে কিছুটা পানি ঢেলে দিল কালু খাঁর মুখে।

বৃদ্ধ পানি খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেন—বনহুর, সরে আয়, আরও কাছে সরে আয়।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলেন—এই তো আমি তোমার পাশে বাপু।

বৃদ্ধ কালু খাঁ বলে ওঠে—বনহুর, আমি তোর বাপু নই। আমি তোর বাপু নই বনহুর। বৃদ্ধ কালু খাঁ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সে প্রায় বিশ বছর আগে—বালিশের তলা থেকে একটা মালা বের করে বনহুরের হাতে দেয়—বিশ বছর আগে যখন তোকে কুড়িয়ে পাই, তখন এই মালাছড়া ছিল তোর গলায়। দেখ বনহুর, এই মালা তুই চিনতে পারিস কিনা?

বনহুর মালাছড়া হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে। হঠাৎ তার আংগুলের চাপে লকেটের ঢাকনা খুলে যায়। কি আশ্চর্য! লকেটের ভিতর তারই ছোটবেলার ছবি। পাশের ঢাকনায় আর একটা ফুটফুটে বালিকার ছবি, পাশাপাশি দু'খানা মুখ। বনহুর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে লকেটের ছবি দু'খানার দিকে। ধীরে ধীরে তার মানসপটে ভেসে ওঠে বিশ বছর আগের একটা দৃশ্য....

তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে একটা নৌকা। দু'জন মাঝি দাঁড় টানছে, একজন মাঝি বসে আছে হাল ধরে। নৌকার সম্মুখ পাটাতনের ওপর পাশাপাশি বসে খেলা করছে একটা বালক আর একটা বালিকা। বালকের বয়স আট-নয় বছর, আর বালিকার বয়স ছয়-সাত। বালক ছবি আঁকছিল। বালিকা রুল দিয়ে ছবির ওপর আঁচড় কেটে ছবিটা নষ্ট করে দেয়। বালক অমনি মুখটা গম্ভীর করে ফেলে। বালিকা

নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়, বিনীত কণ্ঠে বলে—রাগ করলে? ভুল হয়েছে, মাফ করে দাও মনির ভাই।

বালক খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—দোষ করে মাফ চাইলেই বুঝি মাফ পাওয়া যায়.. বালক আর বালিকা মিলে এমনি ঝগড়া চলছে।

নৌকায় ছৈ-এর মধ্যে বসে রয়েছেন দু'জন মহিলা, তাদের অনতিদূরে একজন ভদ্রলোক বসে বসে বই পড়ছেন। ভদ্রলোক বালকের পিতা চৌধুরী মাহমুদ খান। আর ভদ্র মহিলাদের একজন বালকের আম্মা মরিয়ম বেগম, দ্বিতীয় মহিলা চৌধুরী মাহমুদ খানের বোন রওশন আরা বেগম। বালিকা রওশন আরা বেগমের কন্যা—নাম মনিরা, আর বালকের নাম মনির।

ননদের কন্যার নাম সখ করে মরিয়ম বেগমই রেখেছিল— মনিরা বেগম। ভিতরে ভিতরে ছিল তাঁর এক গোপন বাসনা। নিজের পুত্র মনিরের নামের সঙ্গে মনিরা নাম মিল করে রাখাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসে শিশু কন্যাটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিল মরিয়ম বেগম—রওশন আপা, একটা কথা বলবো?

রওশন আরা বেগম বলেছিল—বলো।

মরিয়ম বেগম বলেছিল—আমার পুত্রকে তোমায় দিলাম, তোমার কন্যাটিকে আমি চাই কিন্তু।

আনন্দের কথা। আমার মেয়ে নিয়ে তুমি যদি সুখী হও এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

তারপর মনিরার এক জন্ম উৎসবে মরিয়ম বেগম দু'ছড়া মালা তৈরি করে পুত্র এবং ননদের কন্যাকে উপহার দেন। সে দিন ভাবী আর ননদের মধ্যে কথা নেয়া-দেয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। হেসে বলেছিল মরিয়ম বেগম—এই মালা পরিয়ে দিয়ে আমি কথা পাকা করলাম, মনিরের সঙ্গে বিয়ে দেব মনিরার। সে মালা ছড়াই আজ বনহুরের হাতে। নীরব নয়নে তাকিয়ে আছে সে সম্মুখের দিকে—একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে তার মনের কোণে। যদিও অস্পষ্ট তবু বেশ মনে আছে, মায়ের সে কথার পর কিছুদিন যেতে না যেতে একদিন মনিরার আব্বা মারা গেল। খবর পেয়ে তার আব্বা চৌধুরী মাহমুদ খান স্ত্রী মরিয়ম বেগম ও পুত্র মনিরকে নিয়ে দেশের বাড়ি গেল। ফিরে আসার সময় শোকাতুরা বোনকে নিয়ে চলেন সঙ্গে করে।

নৌকা চলছে... সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। মনির আর মনিরার ঝগড়া থেমে গেলেও রাগ পড়েনি। মনির উঠে গিয়ে পিতার পাশে বসলো। চৌধুরী মাহমুদ খান হেসে বলেন—এত গম্ভীর কেন মনির? মনিরার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে মনির—আমি ছবি আঁকছিলাম, মনিরা নষ্ট করে দিয়েছে।

হেসে বলেন চৌধুরী সাহেব-ও এই কথা। মা মনিরা, এদিকে এসো তো!

ভয়ে ভয়ে মনিরা গিয়ে দাঁড়ালো মামুর পাশে। চৌধুরী সাহেব তাকে আদর করে কোলে টেনে নিয়ে বলেন—তোমার মনির ভাইয়ের আঁকা ছবি নষ্ট করে দিয়েছ?

বালিকা মৃদুস্বরে বলে—ভুল হয়েছে মামুজান। আমি মনির ভাইয়ের কাছে কত করে মাফ চাইলাম, মাফ করলো না।

সে কি মনির, ভুল করে মনিরা যদি একটু ক্ষতি করেই থাকে, তবে কি তা ধরতে হয়? এসো মনি, বলো— তোমাকে আমি মাফ করে দিয়েছি।

মনির মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে— দিলাম ওকে মাফ করে।

ঠিক সে মুহূর্তে নৌকাখানা দুলে উঠলো। মাঝিদের মধ্য থেকে একজনের গলা শুনা গেল—হুজুর ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, হুশিয়ার—হুশিয়ার....

চৌধুরী সাহেব ছৈ-এর ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখমণ্ডল তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

গোটা আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া।

মনির এসে দাঁড়িয়েছে পিতার পাশে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। মনিরাকে বুকে চেপে ধরে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলেন রওশনআরা বেগম। মরিয়ম বেগম পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে নৌকাখানা মোচার খোলার মত দুলছে, চৌধুরী সাহেব চিৎকার করে মাঝিদের সাবধান হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। অন্য কোনদিকে তাঁর খেয়াল নেই।

একে অন্ধকার রাত। তার ওপর প্রচণ্ড দাপট। মাঝিরা মরিয়া হয়ে নৌকাখানা সামলাতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৌকাখানাকে রক্ষা করতে পারলো না তারা। নদীবক্ষে নৌকাখানা তলিয়ে গেল।

খোদার হয়ত রহম ছিল। অল্পক্ষণেই ঝড়ের বেগ কমে এলো চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন, তাঁদের নৌকা গভীর নদীতে ডুবে যায়নি। নদীর একেবারে কিনারে এসে ডুবেছিল।

মাঝিদের সাহায্যে চৌধুরী সাহেব সপরিবারে তীরে পৌছতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একি, মনির কোথায়। চৌধুরী সাহেব মরিয়ম বেগম, রওশন আরা বেগম, মনিরা সবাই আছে—শুধু নেই মনির।

মরিয়ম বেগম বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন। চৌধুরী সাহেব অন্ধকারেই পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন, আর পুত্রের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে এলো। একমাত্র পুত্রের এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম পাগল-পাগলিনী প্রায় হয়ে ছিল। রওশন আরা বেগমও কেঁদেকেটে আকুল হলেন।

ওদিকে স্রোতের টানে বহুদূর ভেসে গিয়েছিল মনির।

নদীর কিনারে বালির ওপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে সে। খোদার মহিমায় জীবন বেঁচে গেছে মনিরের।

এমন সময় নদীর কিনার ধরে এগিয়ে আসছিল দস্যু কালু খাঁ। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মনিরের দিকে। দেখতে পায় সুন্দর ফুট-ফুটে একটা বালক পড়ে আছে বালির ওপরে। বালকটি মৃত না জীবিত দেখার জন্য কালু খাঁ বসে পড়ে তার পাশে। বুকে কান লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। যখন বুঝতে পারে বালক মৃত নয় জীবিত, তখন তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটা নতুন আশার আলো উঁকি দিয়ে যায় কালু খাঁর মনে। অতি যত্নে কাঁধে উঠিয়ে গহন বনের দিকে পা বাড়ায় সে....

কালু খাঁ অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠে—বনহুর!

সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর, কালু খাঁর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—বাপু!

কালু খাঁ বলতে আরম্ভ করে—বনহুর, তারপর তোকে নিয়ে এসে আমি নিজের ছেলের মতই লালন-পালন করতে লাগলাম। দিন দিন বড় হতে লাগলি তুই। ভুলে গেলি তোর পিতামাতার কথা। একদিন ফিরে এসে দেখি, তুই বনের মধ্যে একটা ঝোপের পাশে খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে

পড়েছিস। ভোরের সূর্যের আলো পড়েছে তোর মুখে। অপূর্ব সুন্দর লাগছিল তোকে। যেন শিশিরস্নিগ্ধ একটা ফুল। কতক্ষণ যে আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শব্দ 'বনহুর'!

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—বাপু!

হ্যাঁ, তারপর ধীরে ধীরে মনির মুছে গিয়ে তৈরি হলো আমার বনহুর। আমি তোকে খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলাম। একদিন দস্যু কালু খাঁ পরাজিত হলো বনহুরের কাছে। জয়ী হলো সে। সেদিন আমার দস্যু—জীবন সার্থক হলো, নিঃসন্তান কালু খাঁ পুত্ররত্ন লাভে সক্ষম হলো..... হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে কালু খাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ আমার সাধনা সার্থক হয়েছে। আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। দস্যু কালু খাঁ মরে গেছে.... দস্যু কালু খাঁ মরে গেছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দস্যু বনহুর। হাঃ হাঃ হাঃ, একদিন কালু খাঁর ভয়ে দেশবাসী প্রকম্পিত হয়ে পড়েছিল, আজ প্রকম্পিত হচ্ছে দস্যু বনহুরের ভয়ে। আমার সাধনা সার্থক হয়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ হঠাৎ উঠে বসতে যায় কালু খাঁ, সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। বনহুর দু'হাতে তুলে ধরে ডাকে.... বাপু... বাপু....

কিন্তু কালু খাঁ তখন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বনহুর কালু খাঁর প্রাণহীন দেহটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে— বাপু... বাপু....

অমনি ছুটে এলো নূরী।

নূরী দস্যু কালু খাঁর পালিতা কন্যা। অবশ্য নূরীর পিতা দস্যু কালু খাঁরই একজন অনুচর ছিল। দস্যুতা করতে গিয়ে নিহত হয় নূরীর বাবা। সে হতে নূরী রয়ে যায় কালু খাঁর নিকটে।

বনহুর এই বনে খেলার সাথী হিসেবে নূরীকেই পেয়েছিল পাশে। বনহুরকে ভালবাসতো নূরী। কিন্তু বনহুরের মনে নূরী তখনও দাগ কাটতে পারেনি। বনহুর নিজকে নিয়ে নিজেই ব্যস্ত থাকতো।

নূরী ছুটে এসে কালু খাঁকে বিছানায় ঢলে পড়ে থাকতে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে—বাপু! এ কি হয়েছে তোমার!

বনহুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—নূরী, বাপু চলে গেছে। বাপু চলে গেছে....

বিলাপ করে ওঠে নূরী—বাপু চলে গেছে। হায়, একি হলো! একি হলো-----

বনহুর দু'হাতে মুখ ঢেকে ছোট বালকের ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

❑

আজ ক'দিন হলো কালু খাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘন বনের ছায়ায় কবর দেয়া হয়েছে তাকে। বনহুর দিনরাত সে কবরের পাশে বসে থাকে। এই গহন বনে সে যে ঐ একটা মানুষকেই ভালবাসতো। সে কোনদিন ভাবতে পারেনি— কালু খাঁ তার পিতা নয়। আজ বিশটা বছর ধরে বনহুর তাকেই চিনে এসেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে এসেছে তাকে। তার যে কোন পিতা-মাতা ছিল, সে কথা ভাবতেও কষ্ট হতে লাগলো বনহুরের। সে যে শিক্ষা পেয়েছে সে শিক্ষা সভ্য সমাজের নয়, দস্যু কালু খাঁ তাকে নিজের মনের মত গড়ে তুলেছিল।

এহেন পিতৃসমতুল্য কালু খাঁর শোক সহসা ভুলা বনহুরের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বনহুর কালু খাঁর কবরের পাশে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় তার পাশে। বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—হুর, বাপু চলে গেছে, তার জন্য সবসময় মন খারাপ করে কোন লাভ হবে না।

মুখ তুলে বনহুর—নূরী, আমি যে বড় একা।

এই তো আমি আছি তোমার পাশে।

নূরী!

চলো হুর, সমস্ত অনুচর তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নূরী!

ভুলে যেও না হুর, তুমি দস্যুসন্তান।

না না, আমি দস্যু-সন্তান নই, আমি দস্যু-সন্তান নই....

সেকি! এসব তুমি কি বলছো হুর?

নূরী জানত—বনহুর কালু খাঁরই পুত্র, তাই সে অবাক হয়ে কথাটা বলেন।

বনহুর বুঝতে পারলো, কথাটা সে ভুল করেছে। কালু খাঁর হাত ধরে সে শপথ করেছে, কোনদিন সে কাউকে বলবে না, সে দস্যু কালু খাঁর পুত্র নয়। না না, সে দস্যু-সন্তান, সে দস্যু-সন্তান , উঠে দাঁড়ায় বনহুর, নূরীকে লক্ষ্য করে বলে— চলো নূরী, আজ হতে আমি ভুলে গেলাম সব।

❑

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট বনহুর। সামনে কয়েকজন দস্যু দণ্ডায়মান। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—আজ আমরা মধুনগরের জমিদার বাড়িতে হানা দেব। মধুনগরের জমিদার বাসব নারায়ণ অতি দুষ্ট, শয়তান লোক। শুনেছি, একটা পয়সাও সে ভিখারীকে দান করে না। আমি চাই তার অর্থ নিয়ে ধুলোয় ছড়িয়ে দিতে। তোমরা প্রস্তুত?

সমস্বরে বলে ওঠে দস্যু দল—হ্যাঁ সর্দার।

বনহুর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। সমস্ত দস্যু তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই নূরী এসে দাঁড়ালো তার সামনে। একটা গোলাপ ফুল তার দিকে এগিয়ে ধরে বলেন সে— হুর, তোমার যাত্রা শুভ হউক।

বনহুর ফুলটা নিয়ে গু'জে দিল নূরীর খোঁপায়, তারপর ওর চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলেন— আল্লাহ্ হাফেজ!

তাজের পিঠে চড়ে বসলো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে তাজ উল্‌কাবেগে ছুটে চললো, সমস্ত দস্যু অশ্ব ছুটিয়ে দিল তার পিছু পিছু।

গভীর রাত।

জমিদার বাসব নারায়ণ গভীর ঘুমে অচেতন।

অন্যান্য দস্যুদের নিয়ে জমিদার বাড়ির প্রাচীর টপকে অন্তপুরে প্রবেশ করলো। এক মুহূর্তে গোটা বাড়ি প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। যে যেখানে যা পেল, লুটে নিতে লাগলো। বনহুর প্রবেশ করলো জমিদার বাসব নারায়ণের কক্ষে।

দুগ্ধফেননিভ বিছানায় বাসব নারায়ণ তখন সুখস্বপ্ন দেখছিল। বনহুর তার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রিভলবারের মৃদু আঘাত করে ডাকলো—নারায়ণ মশায়, উঠুন।

ধড়মড় করে উঠে বসে বাসব নারায়ণ। সামনে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল তার কণ্ঠ। যমদূতের মত কালো পোশাকে পরা বনহুরকে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হৃদকম্প শুরু হলো তাঁর। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—কে তুমি, কি চাও?

বনহুরের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন —দস্যু বনহুর!

জমিদার বাসব নারায়ণের আড়ষ্ট কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো অস্ফুট একটা শব্দ—দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ।

কিন্তু, কি চাও আমার কাছে?

কি চাই জান না? টাকা—তোমার সমস্ত টাকা আমাকে এ মুহূর্তে দিয়ে দাও। নইলে এ দেখছো, এর এক গুলিতে তোমার টাকার মোহ ঘুচিয়ে দেব।

বাসব নারায়ণ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বনহুরের পায়ের কাছে বসে ছিল—বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। টাকা কোথায় পাবো?

কোথায় পাবে? এসো আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বনহুর দু'পা এগুতেই বাসব নারায়ণ ছুটে গিয়ে সিন্দুক জড়িয়ে ধরলো।

বনহুর এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে সিন্দুক খুলে যত টাকা পয়সা, সোনা-দানা নিয়ে অন্তপুর থেকে বেরিয়ে এলো।

পরদিন গোটা শহরময় ছড়িয়ে ছিল দস্যু বনহুরের এ দুঃসাহসিক দস্যুতার কথা। পুলিশ মহলে পর্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিছুতেই এ দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হননি। তাঁর অভিজ্ঞ জীবনে এ যেন চরম পরাজয়।

পুলিশ সুপার মিঃ বশির আহমদ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি নিজেও বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। গোপনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং কেসটা তাঁর হাতে অর্পণ করেন। অনুরোধ জানিয়ে বলেন, মিঃ রাও, আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে দেশবাসীকে রক্ষা করুন।

মিঃ আহমদের কথা রাখবেন বলে আশ্বাস দেন মিঃ রাও। তিনি ভরসা দিয়ে বলেন—আমি আপনার অনুরোধ রাখবো, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও, আপনার ওপর আমার ভরসা রইলো। দেখুন এ ব্যাপারে আপনার যত টাকা-পয়সা এবং লোকজনের প্রয়োজন হবে পাবেন, পুলিশ ফোর্স সব সময়ের জন্য আপনাকে সাহায্য করবে।

মিঃ আহম্মদের গাড়ি বেরিয়ে যেতেই মিঃ রাওয়ের সহকারী গোপালবাবু এসে হাজির হলেন, মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বলেন— কি হে, ব্যাপার কি? হঠাৎ যে পুলিশ সুপারের আগমন?

একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন মিঃ রাও—ব্যাপার নতুন নয়, পুরানো।

পাশের সোফায় বসে পড়ে বলেন গোপালবাবু—পুরোনো? তাহলেই সেরেছে, রোগ সারতে অনেক ঔষধের প্রয়োজন হবে।

ঠাট্টা নয়, শুনো গোপাল।

বল, সব শুনতে রাজি আছি।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের নোটিস নিয়ে পুলিশ সুপারের আগমন হয়েছিল।

কি বললে, বনহুরকে গ্রেপ্তার? তুমি ঐ কেস হাতে নিলে নাকি?

না নিয়ে কি আর উপায় ছিল। পুলিশ সুপার যখন এসেছেন।

কিন্তু এ কথা ভেবে দেখলে না শঙ্কর, কোথায় দস্যু বনহুর, আর কোথায় তুমি। আজ পর্যন্ত পুলিশবাহিনী যার টিকিটি দেখতে পায়নি, তাকে গ্রেপ্তার করবে তুমি? যা খুশি করোগে, আমি কিন্তু ওসবের মধ্যে নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন শঙ্কর রাও—কেউ যখন তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পায়নি, সে কারণেই আমি এগুতে চাই। দেখতে চাই কে এই বনহুর, কেমন তার শক্তি। গোপাল শনো, আরও সরে এসো আমার কাছে।

এলাম বল।

গোপাল, গত পরশু রাতে জমিদার বাসব নারায়ণের বাড়িতে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে।

এ কথা আমি শুনেছি।

শুনো, সব কথা মন দিয়ে শুনো, তারপর যা হয় বল। আমি একটা বুদ্ধি এঁটেছি।

কি বুদ্ধি শুনি? হাতি ধরবার মত বনহুরকে গ্রেপ্তারের ফাঁদ পাততে চাও নাকি?

এক রকম তাই।

বল, তাহলে শুনি তোমার বুদ্ধির ফাঁদ কত মজবুত হবে?

শুনো, আমাকে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের নিকট যেতে হচ্ছে। কিছু সংখ্যক পুলিশ প্রয়োজন।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার বুদ্ধির কৌশল কিছুটা শুনাও। পুলিশ নিয়ে বনহুরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে নাকি?

না না, তা নয়, কথা হচ্ছে আগামী শনিবারে রায় বাহাদুর শ্যামাচরণের তিন লাখ টাকা তাঁর দেশের বাড়ি থেকে শহরের বাড়িতে আনবে।

একথা তুমি জানলে কি করে?

জানতে হয় না, জেনেছি।

তার মানে?

মানে এই রকম একটা অভিনয় করতে হবে। আমি আজই একবার রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। তিনি যেন এই রকম একটা কথা সকলের মধ্যে রটিয়ে দেন এবং নিজের সই করা কয়েকটা কাগজ—যাক সব বলে আর কাজ নেই, পরে সব জানতে পারবে।

তবু একটু বল না?

তারপর কয়েকজন পাহারাদার সঙ্গে করে শ্যামাচরণ মহাশয়ের নায়েব দেশের বাড়ি থেকে মোটরে তিন লাখ টাকা নিয়ে রওনা দেব, কিন্তু আসলে তাদের কাছে কোন টাকা-পয়সা থাকবে-না। দস্যু বনহুর জানবে তিন লাখ টাকা যাচ্ছে। এ সুযোগ কিছুতে নষ্ট করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই সে গাড়িতে হানা দেবে।

খাসা বুদ্ধি তোমার!

হ্যাঁ, খাসা বুদ্ধি এঁটেছি গোপাল। যে গাড়িতে টাকা আসছে, সে গাড়িকে অনুসরণ করবে পুলিশ ফোর্স, সকলের হাতেই থাকবে গুলিভরা রাইফেল। অতি গোপনে থাকবে, যেন কেউ জানতে না পারে।

উঠে পড়েন মিঃ শঙ্কর রাও-গোপাল তৈরি হয়ে এসো, এক্ষণি বেরুবো।

হাই তুলে উঠে দাঁড়ায় গোপালবাবু—যাত্রা তোমার জয়যুক্ত হউক!

❑

বনহুর কক্ষে পায়চারী করছে। এক পাশে বিরাট একটা মশাল জ্বলছে। সম্মুখে দণ্ডায়মান তার অনুচরবৃন্দ। মশালের আলোতে দস্যু বনহুরের জমকালো পোশাক চক্‌চক্‌ করে উঠছে। বনহুরের আসনের সামনে একটা টেবিল, টেবিলে একখানা চিঠি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

বনহুর কাগজখানা হাতে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—এ চিঠি কোথায় পেলে?

একজন দস্যু বলে ওঠে—সর্দার, একটা লোকের পকেট থেকে চিঠিখানা পড়ে গিয়েছিল, রহমান কুড়িয়ে এনে আমাকে দিয়েছে।

হঠাৎ বনহুর হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে ঐ রকম আর একখানা কাগজ বের করে ঐ কাগজখানার পাশে রাখে। তারপর ঐ দস্যুটিকে বলে—কাগজ দু—খানা পড়ো।

দস্যুটি কাগজ দু'খানা হাতে তুলে নিয়ে বলে ওঠে—একি সর্দার, দুটোতেই যে একই কথা লেখা রয়েছে!

চিঠি দুটোতে লেখা ছিল—

নায়েব বাবু, আমার তিন লাখ টাকার
প্রয়োজন। আগামী পরশু আমার গাড়ি
পাঠাবো। কয়েকজন পাহারাদার সহ
ঐ টাকা নিয়ে আপনি স্বয়ং চলে আসবেন।

—রায় বাহাদুর শ্যামচরণ।

দস্যুটি কাগজ দু'খানা পড়া শেষ করে আবার টেবিলে রাখে। আশ্চর্য। দু'খানা কাগজের লেখা একই লোকের।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের এটা একটা নতুন ফন্দি। শুধু ঐ দুটি নয়, অমনি আরও অনেক চিঠি এখানে সেখানে গোপনে ছড়ানো হয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে এমন লোক পৃথিবীতে আছে নাকি? যাক্ এবার তোমরা বিশ্রাম করোগে।

দস্যুগণ বেরিয়ে যায়। বনহুর নিজের বিশ্রামঘরে প্রবেশ করে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় সেখানে। মধুর কণ্ঠে ডাকে—হুর!

নূরী বনহুরকে আদর করে 'হুর' বলে ডাকতো।

বনহুর মাথার পাগড়িটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে— কি খবর নূরী?

—হুর, তোমার দেখাই যে পাওয়া যায় না। সারাটা দিন তুমি কোথায় কাটাও?

বনহুর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলে— সারাটা দিন আমি তোমার পাশেই থাকি, তুমি আমাকে দেখতে পাও না নূরী?

নূরী বনহুরের পাশে গিয়ে বসে, তার জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলে—মিছে কথা। আমি অন্ধ বুঝি?

নূরী, বনহুর কি মেয়েছেলে, তাই.....

হুর, আমি যে বড় একা। এ গহন বনে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে? নূরীর কণ্ঠে বেদনা ঝরে পড়ে।

বনহুর অবাক হয়ে তাকায় নূরীর মুখে।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—এ বনে আসা অবধি আমি তোমাকে সাথীরূপে পেয়েছি, হুর। তুমিই যে আমার সব।

নূরী, তুমি আমাকে ধরে রাখতে চাও?

না, ধরে রাখতে চাইনে, কিন্তু.......

বুঝেছি, আবার যেন ফিরে আসি এ তো? হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বনহুর—পাগলী আর কি!

না, আমি নই, তুমি পাগল। কিছু বুঝ না, বুঝতে চাও না। এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না, হুর!

নূরী, এখন বিশ্রাম করবো। তুমি এখন যাও লক্ষ্মী মেয়ে।

বনহুরের কথায় নূরী অভিমানভরে উঠে দাঁড়ায়—আচ্ছা আমি যাচ্ছি। আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

খপ্ করে নূরীর হাত ধরে ফেলে বনহুর—রাগ হলো?

আমি রাগ করলে তাতে তোমার কি আসবে যাবে? ছেড়ে দাও আমার হাত।

নূরী, অভিমান করো না। একটু বিশ্রাম করেই আবার আমাকে বেরুতে হবে।

তার মানে, আবার এ রাতেই তুমি বেরুবে?

হ্যাঁ নূরী, আমার অনেক কাজ।

শুধু কাজ আর কাজ, আজ নাই-বা বেরুলে!

তা হয় না নূরী, বেরুতেই হবে।

নূরী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

বনহুর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়।

❑

গভীর রাত। তাজের পিঠে চড়ে বসলো বনহুর। আজ শরীরে স্বাভাবিক ড্রেস, প্যান্ট-কোট-টাই, মাথায় ক্যাপ। পকেটে কিন্তু গুলিভরা রিভলবার।

গহন বন বেয়ে, নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুক চিরে ছুটে চললো বনহুরের অশ্ব। প্রান্তর পেরিয়ে এক পল্লীতে এসে পৌঁছল বনহুর। এবার গতি অতি মন্থর করে নিল সে। শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো। অদূরে দেখা যাচ্ছে ধবধবে সাদা রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের বাড়ি।

বনহুর এ বাড়ির সামনে গিয়ে অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো।

সদর গেটে একজন পাহারাদার বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছিল, হেঁকে উঠলো পাহারাদার—কোন্ হ্যায়?

বনহুর তাজকে রেখে এগিয়ে গেল পাহারাদারের নিকটে— আমি শহর থেকে আসছি। রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় পাঠিয়েছেন। নায়েব বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পাহারাদার লম্বা একটা সেলাম ঠুকে বলেন—আইয়ে বাবুজী, হল ঘরমে বঠিয়ে, হাম নায়েব বাবুকো বুলাতা হুঁ।

আচ্ছা, বনহুর হলঘরে গিয়ে বসলো।

পাহারাদার লণ্ঠন হাতে অন্দরবাড়িতে প্রবেশ করে।

কিছুক্ষণ পর নিদ্রাজড়িত চোখ দুটি মুছতে মুছতে কক্ষে প্রবেশ করেন নায়েব বাবু।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালো, তারপর বলেন—আমি শহর থেকে আসছি। রায় মহাশয় আমাকে পাঠিয়েছেন।

বৃদ্ধ নায়েব মহাশয় বলে ওঠেন—হঠাৎ এত রাতে তিনি কি মনে করে আপনাকে পাঠালেন?

বনহুর পকেট থেকে সে চিঠিখানা বের করে নায়েব মহাশয়ের হাতে দিয়ে বলেন—এই চিঠি তিনি দিয়েছেন।

লণ্ঠনের আলোতে বৃদ্ধ চিঠিখানা দেখলেন, তারপর তাকালেন বনহুরের মুখে।

বনহুর হেসে বলেন—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? দেখুন পরশু যেভাবে টাকা পাঠানোর কথা ছিল, সেভাবে পাঠানো নিরাপদ নয়, সে কারণেই রায় মহাশয় পাঠিয়েছেন। আমি যেন গোপনে টাকা নিয়ে তাঁর হাতে পৌঁছে দিই।

বৃদ্ধ নতমস্তকে কিছু ভাবতে লাগলেন।

বনহুর গম্ভীরভাবে বলেন—এ চিঠি রায় মহাশয়ের লেখা কিনা ভাবছেন বুঝি?

না না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তিরিশ বছর ধরে আমি রায় মহাশয়ের কাজ করছি, তাঁর হাতের লেখা চিনবো না, কি যে বলেন!

তাহলে অবিশ্বাসের কিছু নেই?

না, কিন্তু......

আর কিন্তু কি আছে নায়েব বাবু?

না আমি বলছিলাম, হঠাৎ এভাবে টাকা......

দেয়াটা কি উচিত হবে, এই তো ভাবছেন? আমি আমার নাম-ঠিকানা সব লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

বেশ, তাই হবে। বসুন আমি টাকা নিয়ে আসছি। নায়েব বাবু কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। আগের দিনের সরল সহজ মানুষ, বনহুরকে এতটুকু অবিশ্বাস করলেন না। কিছুক্ষণ পর এক-গাদা নোট নিয়ে ফিরে এলেন, তারপর বনহুরের হাতে দিয়ে বলেন—সাবধানে নিয়ে যাব, পথে চোর-ডাকাত না হামলা করে।

সে কারণেই তো এত রাতে, এত গোপনে আমার আসা। টাকাগুলো গুছিয়ে নিয়ে, নাম আর ঠিকানাসহ একটা রসিদ লিখে দিল বনহুর নায়েব বাবুর হাতে—এটা রেখে দিন।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই নায়েব বাবুর লণ্ঠনের সামনে রসিদখানা মেলে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন।

কাগজখানায় লেখা আছে—
নায়েব শশধর বাবুর নিকট হইতে তিন
লাখ টাকা বুঝে পেয়ে রসিদ লিখে
দিলাম।

—'দস্যু বনহুর'

বৃদ্ধ নায়েবের শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো—সর্বনাশ হয়েছে, ওরে কে কোথায় আছিস, সর্বনাশ হয়েছে... নায়েব বাবুর চিৎকারে দারোয়ান ছুটে এলো সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবাই।

সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করছে—কি হলো, কি হলো?

হাঁপাতে হাঁপাতে নায়েব বাবু আঙ্গুল দিয়ে বাইরে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—দস্যু বনহুর সব নিয়ে গেঁছে। ঐ দিকে গেছে, তোমরা ধরো—ধরো ওকে-----

সবাই ছুটলো সদর গেটের দিকে। বাইরে যখন এসে দাঁড়ালো ওরা, তখন চারদিকে শুধু ঘন জমাট অন্ধকার। দূরে—অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে অশ্ব পদশব্দ—খট্ খট্ খট্------

❑

পরদিন গোটা দেশময় হৈ চৈ পড়ে গেল। কাগজে কাগজে বেরুলো দস্যু বনহুরের অদ্ভুত দস্যুতার কথা।

মিঃ শঙ্কর রাও মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। কি করতে কি ঘটে গেল! এত বড় ফন্দিটাও তাঁর টিকলো না। বরং বেচারা রায়বাহাদূর শ্যামাচরণ এত বড় একটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া হয়ে উঠলেন শঙ্কর রাও।

পুলিশ মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো! মিঃ বশীর আহমদ পর্যন্ত বোকা বনে গেল! কারও মুখে যেন কোন কথা নেই।

সমস্ত পথে-ঘাটে-মাঠে, অলিগলিতে পুলিশ পাহারা রইলো। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই তারা তাকে গ্রেপ্তার করবে। পুলিশমহল থেকে ঘোষণা করে দেয়া হলো, যে দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরে এনে দিতে পারবে, তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

অর্থের লোভে যে যাকে সন্দেহ হলো, ধরে নিয়ে এলো থানায়। একদিন গভীর রাতে কয়েকজন পুলিশ রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিলো, এমন সময় একটা পাগল ছেঁড়া জামাকাপড় পরে আবোল-তাবোল বকতে বকতে চলে যাচ্ছিলো। পুলিশের দৃষ্টি আড়াল হয়ে যাবে, এমন সময় দু'জন পুলিশ ধরে ফেললো তাকে—এ বেটা, কোথায় যাচ্ছিস?

পাগল লোকটা মাথা চুলকাতে আরম্ভ করলো। পুলিশদের সন্দেহ আরও বাড়লো, একজন লাঠি উঁচিয়ে বসিয়ে দেবে আর কি, এমন সময় একটানে মুখ থেকে দাঁড়ি আর গোঁফ খুলে ফেলে বলেন পাগল লোকটা—আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা বেকুফ বনে গেল। লম্বা সেলুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সকলে। হৃৎপিণ্ড তখন ধক্ ধক্ করতে শুরু করেছে ওদের। না জানি এর জন্য কপালে কি আছে, এত কষ্টের পুলিশের চাকরিটা না খোয়া যায়।

মিঃ হারুন হেসে বলেন—হ্যাঁ, এই রকম সতর্ক থাকবে। পাগল কিংবা ভিখারী বলেও কাউকে খাতির করবে না। কথা ক'টি বলে চলে গেল ইন্সপেক্টার।

এতক্ষণে পুলিশগুলো হ্যাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

নূরী একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চিন্তিত মনে বসে আছে।

এমন সময় বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে। নূরীকে বিষণ্ন মুখে বসে থাকতে দেখে হেসে বলেন—কি এত ভাবছো বসে বসে?

তোমার যেন কোন ভাবনা নেই! এই দেখ দেখি। খবরের কাগজের একটা জায়গা মেলে ধরলো বনহুরের চোখের সম্মুখে—দেখেছো?

ওঃ তাই বুঝি এত ভাবনা? পরক্ষণেই হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে বনহুর, তারপর বসে পড়ে নূরীর পাশে।

নূরীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন— তোমার কি জীবনের এতটুকু ভয় নেই?

ভয়! কিসের ভয় নূরী?

তোমাকে যে জীবিত কি মৃত ধরে দিতে পারবে, সে লাখ টাকা পাবে।

নূরী, আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দিয়ে এক লাখ টাকা গ্রহণ করি।

ছি! তোমার এত টাকার মোহ?

টাকা? বনহুর টাকার পাগল নয় নূরী! সে চায় দুনিয়াটাকে দেখতে।

বেশ হয়েছে, অনেক দেখেছো, এবার মানুষ হবার চেষ্টা কর। কেন, আমি কি মানুষ নই?

মানুষ যদি হতে তবে এমন সব আজগুবি কথা বলতে না। থাক, চল দেখি এবার কিছু খাবে।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়—উঁহুঁ, কিছু খাবো না, নূরী।

কোথায় যাবে এই ভর সন্ধ্যায়?

প্যান্টের পকেট থেকে কয়েক তোড়া নোট বের করে নূরীর সামনে ধরে—এগুলো মালিককে পৌঁছে দিতে।

তার মানে?

প্যান্টের পকেটে টাকার তোড়াগুলো রাখতে রাখতে বলে বনহুর—ঐ যে সেদিন রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের নায়েবের কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে এসেছিলাম তা এখনও মালিকের নিকটে পৌঁছে দেয়া হয়নি।

তুমি আশ্চর্য মানুষ।

কেন?

টাকা আনলেই বা কেন, আবার ফিরিয়ে দেবারই কি প্রয়োজন আছে?

নূরী, বনহুর সব পারে। ছলনা বা কৌশলে বনহুরকে বন্দী করা এত সহজ নয়, সেটাই জানিয়ে দিলাম। আর অযথা বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়কে বিপদগ্রস্ত করতে চাইনে। শ্যামাচরণ মহাশয় কিছুতেই এই তিন লাখ টাকা ছাড়বে না, বৃদ্ধ নায়েব বাবুকেই পরিশোধ করতে হবে, নয়তো হাজত বাস।

তাতে তোমার কি, যা হয় হউকগে।

তা হয় না নূরী, অযথা কাউকে কষ্ট দেয়া আমার ইচ্ছে নয়, আচ্ছা চলি, ভোরে ফিরে আসবো।

নিস্তব্ধ প্রান্তরে জেগে ওঠে বনহুরের অশ্ব-পদশব্দ। নূরী দু'হাতে বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়ায়, বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে ওঠে, না জানি সে কেমনভাবে ফিরে আসবে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণের বাড়ির পেছনে গিয়ে বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে। একে গভীর অন্ধকার, তার উপরে বনহুরের শরীরে কালো ড্রেস থাকায় অন্ধকারে মিশে গেল সে।

অতি সহজেই রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের কক্ষের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছে। বনহুর পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে অল্পক্ষণের মধ্যেই জানালার কাঁচ খুলে ফেললো, তারপর প্রবেশ করলো কক্ষে।

খাটের ওপর রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ শায়িত। গোটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে এতক্ষণে একটু ঘুমিয়েছেন। তিন লাখ টাকার শোক কম নয়, টাকার শোকে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। যত দোষ ঐ নায়েব বাবুর। তিনি না জেনেশুনে অপরিচিত একটা লোককে বিশ্বাস করলেন, এত টাকা ছেড়ে দিল তার হাতে। না, এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। বৃদ্ধ পুরানো নায়েব বলে খাতির করলে চলবে না, জেল খাটাবেন। কিছুতেই রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ তাঁকে রেহাই দেব না.... এতসব ভাবতে ভাবতে কেবলমাত্র ঘুমিয়েছেন।

বনহুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর গায়ে মৃদু আঘাত করে ডাকলো—উঠুন।

রায়বাহাদুর ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে তাকালেন সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে যাব, অমনি বনহুর রিভলবার চেপে ধরলো তার বুকে—খবরদার, চিৎকার করবেন না।

বনহুরের কালো অদ্ভুত ড্রেস, মুখে গাল পাট্টা রায়বাহাদুরকে আতঙ্কিত করে তুললো। তিনি একটা ঢোক গিলে বলেন—তুমি কে?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল—দস্যু বনহুর!

রায়বাহাদুর রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিল, চিৎকার করে বলেন—তুমিই দস্যু বনহুর!

হেসে বলেন বনহুর—হ্যাঁ।

আবার কি জন্য এসেছো? আমার তিন লাখ টাকা নিয়েও তোমার লোভ যায়নি?

ভুল বুঝেছেন রায়বাহাদুর মহাশয়, আপনার টাকা নেইনি, আপনার নিকটে পৌঁছে দেবার জন্যই আপনার নায়েব বাবুর কাছ হতে নিয়ে এসেছি। কারণ আপনি যেভাবে টাকা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেভাবে আনাটা নিরাপদ নয়, তাই আমি------

ওঃ তাহলে তুমি টাকাটা অন্য কেউ লুটে নেবার পূর্বেই লুটে নিয়েছো, শয়তান কোথাকার!

দেখুন আমি শয়তান নই, শয়তানের বাবা। যাক বেশি বিরক্ত করতে চাইনে আপনাকে এ দুপুর রাতে। বুঝতেই পারছি আপনি এ তিন লাখ টাকার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। সে কারণেই আমি তাড়াতাড়ি এলাম, এ নিন আপনার টাকা। প্যান্টের পকেট থেকে তিন লাখ টাকার তোড়া বের করে রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের হাতে দিয়ে বলে—গুণে নিন।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের চোখে মুখে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে। একবার হস্তস্থিত টাকা আর একবার বনহুরের কালো গালপাট্টা বাঁধা মুখের দিকে তাকান তিনি। একি অবিশ্বাসের কথা, বনহুর তবে কি তাকে হত্যা করতে এসেছে? ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল।

বনহুর পুনরায় বলে ওঠে—নিন টাকা গুণে নিন। এক পা পাশের চেয়ারে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ কম্পিত হাতে টাকার তোড়াগুলো গুণে নিলেন।

বনহুর বলেন—ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

বনহুর এক টুকরা কাগজ আর কলম বাড়িয়ে ধরলো রায়বাহাদুর মহাশয়ের সামনে—একটা রসিদ লিখে দিন, আমি তিন লাখ টাকা বুঝে পেলাম।

শ্যামাচরণ কাগজ আর কলমটা হাতে নিয়ে লিখলেন।

বনহুর হেসে বলেন—নিচে নাম সই করুন।

শ্যামাচরণ মহাশয় নাম সই করে কাগজখানা বনহুরের হাতে দিল।

বনহুর কাগজখানা হাতে নিয়ে আর একবার পড়ে দেখলো, তারপর পকেটে রাখলো। রিভলবার উঁচিয়ে ধরে পিছু হটতে লাগলো সে, পর মুহূর্তে যে পথে এসেছিল সে পথে অদৃশ্য হলো।

এবার বনহুরের অশ্ব রায় মহাশয়ের দেশের বাড়ির সদর গেটে গিয়ে থামলো, অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রাচীর টপকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো সে। নায়েব বাবুর কক্ষ সেদিন চিনে নিয়েছিল বনহুর, আজ সে কক্ষের দরজায় আঘাত করলো।

নায়েব বাবুর চোখে ঘুম নেই, তিন লাখ টাকা যেমন করে হউক তাকে পরিশোধ করতেই হবে, না হলে নিস্তার নেই। কিন্তু কোথায় পাবেন তিনি অত টাকা। মাথার চুল ছিঁড়ছেন তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠিক সে মূহূর্তে কক্ষের দরজায় মৃদু শব্দে নায়েব বাবু বিছানায় উঠে বসে বলেন—কে?

বনহুর পুনরায় শব্দ করে ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্.......

এবার নায়েব বাবু শয্যা ত্যাগ করেন। দরজা খুলে দিয়ে সম্মুখে বনহুরকে দেখেই চিৎকার করতে যান, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর চেপে ধরে তার মুখ—ভয় নেই, আজ টাকা নিতে আসিনি। রায় বাহাদুর মহাশয়ের নিকটে টাকা পৌঁছে দিয়েছি, এই নিন রসিদ।

বৃদ্ধ নায়েব কম্পিত হাতে রসিদখানা হাতে নিয়ে হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না এ কথা।

বনহুর যেমনি এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে যায়।

রাতের ঘটনা নিয়েই পুলিশ অফিসে আলোচনা চলছিল। রায়বাহাদূর শ্যামাচরণ মহাশয়কে দস্যু বনহুর সে তিন লাখ টাকা ফেরত দিয়ে গেছে, এটাই আলোচনার বিষয়বস্তু।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, মিঃ গোপাল বাবু, রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় এবং বৃদ্ধ নায়েব বাবু সকলেই উপস্থিত আছেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর।

মিঃ শঙ্কর রাও বলেন—শুধু আশ্চর্য নয় ইন্সপেক্টার অদ্ভুত সে।

গোপাল বাবু হঠাৎ বলে বসে—সত্যি আশ্চর্য বলে আশ্চর্য। কেনই বা সে টাকা নিল, আবার কেনই বা ওভাবে ফিরিয়ে দিয়ে গেল! নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর ভয় পেয়েছে।

শঙ্কর রাও একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন—ভয় পাবার বান্দা সে নয়। সে দেখিয়ে দিল, আমি সব পারি। কিন্তু বাছাধন জানে না শঙ্কর রাও কম নয়, আমি একবার দেখে নেব দস্যু বনহুরকে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন চৌধুরী সাহেব। সহাস্যমুখে বলেন—গুড মর্নিং।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেবকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন, তারপর তিনি আসন গ্রহণ করার পর সবাই আসন গ্রহণ করলেন।

ইন্সপেক্টার সাহেব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি চৌধুরী সাহেব, হঠাৎ যে?

কেন, আসতে নেই নাকি? হেসে বলেন চৌধুরী সাহেব।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন বলেন—এখানে কি মানুষ সহজে আসতে চায়?

তার মানে?

মানে যখন একটা কিছু অঘটন ঘটে, তখনই লোকে আমাদের এই পুণ্যভূমিতে পদধূলি দেন।

মিঃ হারুনের কথায় হেসে ওঠেন সবাই।

চৌধুরী সাহেব বলেন—সে কথা মিথ্যা নয় ইন্সপেক্টার সাহেব। তবে আমি অঘটন ঘটিয়ে আসিনি। এসেছি একটা সামান্য কথা নিয়ে।

একসঙ্গে সকলেই চোখ তুলে তাকালেন। মিঃ হারুন জিজ্ঞেস করলেন সামান্য কথা? বলুন, আপনার সামান্য কথাটাই আগে শোনা যাক। কিন্তু তার পূর্বে এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দি। ইনি রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় আর ইনি তাঁর নায়েব শঙ্কর বাবু আর ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও। উনি মিঃ রাওয়ের সহকারী গোপাল বাবু। এবার চৌধুরী সাহেবের পরিচয় দেন—আর উনি চৌধুরী মাহমুদ খান হাসানপুরের জমিদার।

চৌধুরী সাহেব আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম। যদিও আপনাদের নামের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে হাত মিলান—আমিও অত্যন্ত খুশি হলাম, চৌধুরী সাহেব। আপনার সুনাম অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখা হয়নি কোনদিন। আজ এখানে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত হলাম।

চৌধুরী সাহেব বলেন—খবরের কাগজে যে সব ঘটনা পড়লাম এ সব কি সত্য রায়বাহাদুর সাহেব?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব সত্য। কথাটা অতি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়।

মিঃ হারুন হেসে বলেন—না হলে কি আর রায়বাহাদূর মহাশয়ের পুলিশ অফিসে পদধূলি পড়ে।

চৌধুরী সাহেবই বলে ওঠেন—আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম। আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর। টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে সে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছে।

এবার মিঃ রাও কথা বলেন—কাকে আপনি মহৎহৃদয় বলছেন চৌধুরী সাহেব। শয়তান বদমাশ। দস্যুতার এটা একটা নতুন চাল।

কিন্তু শুনা গেছে, সে নাকি অনেক দীন দুঃখীকে মুক্তহস্তে দান করছে।

মিথ্যে কথা চৌধুরী সাহেব, সব আজগুবি কথা। কেউ স্বচক্ষে দেখেছে? দস্যু বনহুর কাকে টাকা দিয়েছে? শয়তানটা যে অতি ধূর্ত—এ কথা মিথ্যে নয়।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—পুলিশকে একেবারে হন্তদন্ত করে মারছে। আমরা তো একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছি, থাক সে কথা। এবার বলুন চৌধুরী সাহেব, আপনার কি কথা?

হ্যাঁ, এতক্ষণ আসল কথাটাই বলা হয়নি। দেখুন আপনারা সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, তখন ভালোই হলো। আমি আপনাদের দাওয়াত করছি। আমার ভাগনী মনিরা বেগমের জন্ম উৎসব। অনুগ্রহ করে আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে যাবেন। এই নিন কার্ড। কার্ড বের করে নাম লিখলেন। তাঁরপর প্রত্যেককে একখানা করে দিয়ে বলেন—মনে কিছু করবেন না। আপনাদের দাওয়াত করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় হেসে বলেন—এটা তো খোশখবর। এলাম কোন্ কাজে, পেলাম দাওয়াত। সত্যি আজকের দিনটা আমার বড় শুভ যাচ্ছে।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—মিথ্যে নয় রায়বাহাদূর সাহেব। শুধু আজকের দিন নয়, কালকের রাত থেকে আপনার শুভরাত্রি শুরু হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব এবার মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বলেন—আপনারা নীরব রইলেন যে? গরীবালয়ে আসছেন তো?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এতবড় একটা লোভ সামলানো কি সহজ কথা! নিশ্চয়ই আসবো।

ধন্যবাদ! একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন চৌধুরী সাহেব। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন—আমি নিঃসন্তান। ঐ ভাগনীটাই আমার পুত্র এবং কন্যা। অনেক আশা, অনেক বাসনা নিয়েই ওকে আমি মানুষ করেছিলাম.....যাক সে সব কথা, আপনারা মেহেরবানি করে আসবেন কিন্তু।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় বলে ওঠেন—চৌধুরী সাহেব, শুনেছিলাম আপনার নাকি একটি পুত্রসন্তান ছিল?

ছিল,— বিশ বছর আগে তাকে হারিয়েছি। ইন্সপেক্টার, আপনাকে কি বলবো, আট বছরের সে বালকের স্মৃতি আজও আমরা ভুলতে পারিনি। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠ—আমার মনির ছিল অপূর্ব, অদ্ভুত ছেলে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন মিঃ হারুন—চৌধুরী সাহেব না জেনে কথাটা বলে ভুল করেছি।

না না, আপনি কোন ভুল করেননি ইন্সপেক্টার সাহেব। আপনি না বললেও সদাসর্বদা তার স্মৃতি আমার হৃদয়ে আঘাত করে চলেছে। অনেক কষ্টে ঐ ভাগনীটাকে চোখের সামনে রেখে তাকে ভুলে আছি। আচ্ছা আজকের মত উঠি তাহলে— কথাটা বলে উঠে পড়েন চৌধুরী সাহেব।

সবাই তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

❑

বাগানে বসে একটা মালা গাঁথছিল নূরী, গুন গুন করে গান গাচ্ছিলো। এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ায় রহমত, নূরীকে জিজ্ঞেস করলো—নূরী সর্দার কোথায়?

ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতেই বলেন নূরী—কি জানি কোথায় সে? আচ্ছা রহমত , শহর থেকে কখন এলে?

এই তো আসছি।

নতুন কোন খবর আছে তাহলে?

খবর না থাকলে কি আর অমনি ছুটে এসেছি।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় দস্যু বনহুরের অনুচর ছড়িয়ে থাকতো। নতুন কোন খবর হলেই এসে জানাতো তারা রহমতের কাছে। রহমত খবর নিয়ে ছুটতো বনহুরের নিকট।

নূরী হেসে বলে—কি খবর রহমত, একটু বল না শুনি?

তুমি আবার শুনবে?

হ্যাঁ, বল?

শহরে এক ধনবান লোক আছেন, ভদ্রলোকের নাম চৌধুরী মাহমুদ খান। আজ সন্ধ্যার পর তার কন্যার জন্ম উৎসব হবে।

তাতে কি হলো? এ আবার নতুন খবর কি?

শুনোই না, চৌধুরী সাহেব তার কন্যাকে বহুমূল্যের একটা হীরার আংটি উপহার দেবেন।

তাই বল। নিশ্চয় খুব সুন্দর হবে সে আংটিটা?

আমি কি আর দেখেছি! তবে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। দেখ নূরী, ঐ আংটিটা যদি তোমার আংগুলে পরো, কি সুন্দর মানাতো!

সত্যি রহমত, আমি হুরকে বলবো, ঐ আংটি আমার চাই। মালা গাঁথা শেষ করে মালাটা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে কথাটা বলে নূরী।

রহমত বলে—যাই সর্দার কোথায় দেখি।

চলে যায় রহমত। নূরী মালা হাতে উঠে দাঁড়ায়। মালা হাতে ঝরণার দিকে এগিয়ে চলে সে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে ঝরনার পাশে একটা পাথরখণ্ডে বসে আছেন বনহুর।

নূরী পা টিপে টিপে বনহুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চট করে মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে বসে ছিল পাথরখণ্ডটার একপাশে। হেসে বলেন—খুব চমকে দিয়েছি, না? চমকাবার বান্দা বনহুর নয়। মালাটা হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করতে থাকে সে।

নূরী আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে—হুর, একটা খবর আছে।

বল!

রহমত এসেছে।

তারপর?

শহরে কোন এক চৌধুরী-কন্যার নাকি জন্ম উৎসব।

হ্যাঁ, সে উৎসবে আমারও দাওয়াত আছে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে নূরী—তার মানে?

মানে আমি যাব সে উৎসবে।

তাহলে তুমিও সে হীরার আংটির কথা জানতে পেরেছো? হুর, ঐ আংটি আমার চাই। বল দেবে আমাকে?

হ্যাঁ নূরী, সে হীরার আংটিটা তোমার ঐ সুন্দর আংগুলে অপূর্ব মানাবে।

হুর, সত্যি তুমি কত ভালবাস আমাকে।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর। মালাটা খুলে অন্যমনস্কভাবে নূরীর হাতে দেয়। তারপর চলে যায় সে দরবার কক্ষের দিকে, যেখানে অনুচরবৃন্দ দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়।

❑

চৌধুরী বাড়ি।

আজ মনিরার জন্ম উৎসব। সকাল থেকে বাড়ির সবাই ব্যস্ত। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ঘসে-মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কয়েকজন পরিচারিকা নিয়ে মরিয়ম বেগম নিজেই এসব করেছেন।

আজ মনিরার মা নেই, রওশন আরা বেগম থাকলে তাঁকে এসব দেখতে হত না, আজ থেকে দু'বছর আগে তিনি কন্যার মায়া ত্যাগ করে জান্নাতবাসিনী হয়েছেন। ননদীনির কথা স্মরণ হতেই মরিয়ম বেগমের মনটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। দু'চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে ছিল দু'ফোটা অশ্রু।

মনিরার মনে আজ আনন্দের উৎস। তার সহপাঠিনীরা আসবে। বান্ধবীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করবে, হাসিগানে ভরে উঠবে আজকের সন্ধ্যাটা। মনিরা গুন গুন করে গান গাইছিল আর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায়।

মরিয়ম বেগম তাকে দেখতে পেয়েই গোপনে চোখের পানি মুছে ফেলেন। তারপর হেসে বলেন—মনিরা, এদিকে শুনো।

মনিরা এসে দাঁড়ায় তার পাশে—আমাকে ডাকছো মামীমা?

হ্যাঁ মা শুনো। বিকেলে কোন্ শাড়ি পরবে ঠিক করে গুছিয়ে রাখোগে, নইলে তখন তাড়াহুড়া করবে।

মামীমা, আমি তোমার একটা শাড়ি পরবো।

সেকি মা, আমার শাড়ি যে সব সেকেলে ধরনের।

হউক না, সে আমার ভালো। আজ আমার জন্ম উৎসব। তোমার শাড়ি হবে আমার আশীর্বাদ।

পাগলী মেয়ে কোথাকার, যদি সখ হয়েই থাকে, তবে এই নাও চাবি, আমার ট্রাঙ্ক খুলে যে শাড়িটা তোমার পছন্দ হয় বের করে নাও।

মনিরা চাবির গোছা হাতে নিয়ে মামীমার কক্ষে চলে যায়। ট্রাঙ্কের ঢাকনা খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। ঝকঝক করছে নানা রঙ-বেরঙের শাড়ি। কোনটা জরীর বুটিদার, কোনটা জরী পেড়ে, কোন্‌টা গোটাটাই জরীর তৈরি, বেনারসী, টিস্যু, নানারকমের শাড়িতে ট্রাঙ্ক ভর্তি।

মনিরা এক-একখানা শাড়ি বের করে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। ট্রাঙ্কের সমস্ত শাড়ি বের করে ফেললো মনিরা। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেল ট্রাঙ্কের তলায়। সুন্দর একখানা ছবি। মনিরা সব ফেলে ফটোখানা তুলে নিল হাতে। বিস্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে রইলো। পাশাপাশি দু'টি মুখ। একটা বালক আর একটা বালিকা। শুভ্র জ্যোৎস্নার মত নির্মল দুটি মুখ। মনিরা ফটোখানা হাতে নিয়ে ছুটলো মামীমার কক্ষে। মরিয়ম বেগমের সম্মুখে ফটোখানা মেলে ধরে বলে মনিরা—মামীমা, এ কাদের ছবি?

মরিয়ম বেগমের দৃষ্টি ছবি খানার ওপর পড়তেই চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, অতি কষ্টে নিজকে সংযত রেখে বলেন তিনি— ও ছবি আবার বের করলি কেন মা?

আগে বল এ ছবি কাদের?

ও ছবি তোর আর মনিরের।

মনির। সে আবার কে, মামীমা?

ওরে, সে যে আমাদের সাত রাজার ধন, হৃদয়ের মণি ছিল, আমাদের ছেলে মনির।

হঠাৎ মনে পড়ে মনিরার একটা কথা, অনেকদিন আগে মা একদিন গল্পের ছলে বলেছিল—মনিরা, তোর মামুজান আর মামীমা তোকে যে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলোরে। বড় আশা ছিল, তোকে একেবারে নিজের করে নেবে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল মনিরা—সে কি মা, আমি কি তাদের নিজেরই নই?

মা বলেছিল—তা নয়, তা নয়। থাক, আর শুনে কাজ নেই, তুমি পড়গে যাও।

মনিরাও কম জেদী মেয়ে নয়! আব্দার ধরে বসলো—তোমাকে বলতেই হবে মা, আমি না শুনে ছাড়ছিনে।

অগত্যা বলেছিল রওশন আরা বেগম—তোর মামুজান আর মামীমার একটা ছেলে ছিল—মনির! তারই জন্য ওরা তোকে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল, আমি কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য সে রত্ন রইলো না।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো— মনির। মামীমা, মনির ভাই খুব সুন্দর ছিল বুঝি?

মরিয়ম বেগম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—হ্যাঁ, অপূর্ব সুন্দর ছিল আমার মনির, যেমন তুই। তাইতো তোর মায়ের কাছ থেকে তোকে চেয়ে নিয়েছিলাম।

মামীমা, তার কি হয়েছিল?

অসুখে সে মারা যায়নি, আমার মণি নৌকাডুবি হয়ে কোথায় ভেসে গেছে।

—তার লাশ তোমরা পেয়েছিলে?

না, অনেক খোঁজাখুজি করেও তার কোন চিহ্ন আমরা পাইনি।

—গলা ধরে আসে মরিয়ম বেগমের।

মনিরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ নয়নে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—মামীমা, এই ছবি আমার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখবো।

তোর যদি ভালো লাগে রাখ মা, কিন্তু ও ছবি যেন আমার চোখে না পড়ে।

মনিরা ছবিখানাকে বুকে আঁকড়ে ধরে মামীমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো মনিরের ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর নীল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ, উন্নত নাসিকা। ছোট বালক হলেও তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে অপূর্ব এক প্রতিভা। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে মনিরা। নিজের শয্যার পাশে টাঙ্গিয়ে রাখলো ছবিখানা।

আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে চৌধুরীবাড়ি। গাড়ি বারান্দায় অগণিত গাড়ি এসে ভীড় জমেছে। মনিরা মামার পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা

জানাচ্ছিল। বান্ধবীরা আসছে কেউ বা ফুলের মালা, কেউ বা ফুলের তোড়া নিয়ে মালাগুলো পরিয়ে দিচ্ছে মনিরার গলায়।

অতিথিরা প্রায় সবাই এসে পড়েছেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, গোপালবাবু, রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় এবং তাঁর নায়েব বাবু পর্যন্ত উৎসবে উপস্থিত হয়েছেন। এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ অতিথি হবেন খান বাহাদুর হামিদুল হক এবং তাঁর পুত্র মুরাদ। কিন্তু এতক্ষণেও তাঁরা এসে পৌঁছলেন না। ভিতরে ভিতরে কিছুটা চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব।

খান বাহাদুর হামিদুল হক একজন ধনবান ব্যক্তি, তেমনি সম্মানিত ব্যক্তিও বটে। তাঁর একমাত্র পুত্র মুরাদ বহুদিন লণ্ডনে শিক্ষালাভ করার পর সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে। চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছা মুরাদের সঙ্গে মনিরার বিয়ে দেব। হামিদুল হক সাহেবেরও এ ইচ্ছা। মনিরার অপূর্ব সৌন্দর্য এবং মহৎ ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। খান বাহাদুর সাহেবের বিপুল ঐশ্বর্য। ভবিষ্যতে নিঃসন্তান চৌধুরী সাহেবের সমস্ত ধনসম্পদ মনিরারই হবে। এই কারণেই খান বাহাদুর সাহেব পুত্র লণ্ডন থেকে ফিরে না আসতেই চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা পাকা করে রেখেছিল।

চৌধুরী সাহেব এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন যদিও মুরাদকে স্বচক্ষে দেখেননি, তবু কথা দিয়েছিল। এহেন অতিথিদের আগমনে বিলম্ব দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব। তিনি মনিরাকে বলেন—মা, তুমি এখন ওদিকে গিয়ে দেখাশুনা করো। আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করি।

মাথা দুলিয়ে বলেন মনিরা—আচ্ছা আমি যাচ্ছি। মনিরা চলে যায়।

চৌধুরী সাহেব গাড়ি বারান্দায় পায়চারী করতে থাকেন।

মনিরা হলঘরে প্রবেশ করে। সম্মানিত অতিথিগণ যে যার আসনে বসে বসে গল্প করছেন। মনিরার কয়েকজন বান্ধবী অর্গানের পাশে বসে গানবাজনা করছে। অনেকেই হাসি গল্পে মেতে উঠেছে। মাঝখানের টেবিলের ওপর স্তূপাকার প্রেজেন্টের জিনিসপত্র। কক্ষে নীল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। হাসিগল্পে আর অর্গানের শব্দে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। একটু পরেই টেবিলে খাবার দেয়া হবে।

শহরের এক প্রান্তে খানবাহাদুর হামিদুল হক সাহেবের বাড়ি। লণ্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ সাজগোজ করে বেরুতেই রাত প্রায় আটটা বাজিয়ে

দিল। নিজেই ড্রাইভ করে চললো মুরাদ, পেছনের আসনে হামিদুল হক সাহেব বসে রইলেন।

নির্জন পথ বেয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

ঠিক সে মুহূর্তে পথের ওপাশের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুটো অশ্ব, একটাতে বনহুর স্বয়ং, অন্যটাতে বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান। দু'জনের শরীরেই অদ্ভুত কালো ড্রেস, মুখে কালো গালপাট্টা বাঁধা। মোটরের সম্মুখে এসে পথ আগলে দাঁড়ালো তারা।

মুরাদ সামনে বাধা পেয়ে গাড়ি রুখতে বাধ্য হলো।

বনহুর রিভলবার উদ্যত করে বলেন—নেমে এসো।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে খানবাহাদুর সাহেবের মুখমণ্ডল। মুরাদের অবস্থাও তাই। হঠাৎ এই বিপদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলেন খান বাহাদুর সাহেব এবং মুরাদ।

বনহুর রিভলবার ঠিক রেখে রহমানকে ইঙ্গিত করলো।

রহমান দ্রুত মুরাদের শরীর থেকে কোটপ্যান্ট-টাই খুলে নিল।

রাগে, ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলো মুরাদ। সেও কম নয়, হাতে একটা অস্ত্র থাকলে দেখিয়ে দিত মজাটা কিন্তু কি করবে, নীরব থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। খান বাহাদুর সাহেব ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কে?

দস্যু বনহুর!

এ্যাঁ বল কি! কি চাও বাবা তোমরা? আমাদের নিকট তো কোন অর্থ নেই।

অর্থ চাই না। শুধু আপনারা গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য নেব। বনহুর তাদের বেঁধে ফেলার ইঙ্গিত করলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রহমান মুরাদ এবং খান বাহাদুর সাহেবকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো, তারপর একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে বসিয়ে দিলো।

বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে মুরাদের পোশাক পরে নিল, এক জোড়া গোঁফ লাগিয়ে নিল নাকের নিচে। কালো একটা চশমা চোখে পরলো, মাথার ক্যাপটা টেনে ঝুকিয়ে নিল সামনের দিকে বেশি করে। বনহুরের চেহারা একেবারে পাল্টে

গেল। বনহুর এবার রহমানকে লক্ষ্য করে বলেন—আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি এদের পাহারায় থাকবে।

ড্রাইভ আসনে উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয় বনহুর।

বনহুরের অজানা কিছু নেই, সে অশ্বচালনা থেকে সব কিছুই চালনা করতে জানতো। বনহুরের একটা বুইক গাড়ি ছিল, সে গাড়ি বনহুর নিজেই চালাতো। শহরে বনহুরের একটা বাড়ি ছিল। সে বাড়িতেই গাড়িখানা থাকতো। মাঝে মাঝে বনহুর দরকার হলে সে বাড়িতে থাকতো।

বনহুর গাড়ি নিয়ে ছুটে চললো।

বনহুরের গাড়ি পৌঁছতেই চৌধুরী সাহেব চিনতে পারলেন, এ গাড়ি খান বাহাদুর সাহেবের। শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন তিনি গাড়ির পাশে কিন্তু একি, খানবাহাদুর সাহেব কই? অপরিচিত এক যুবক বসে আছে ড্রাইভ আসনে। চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন এই যুবকই খান বাহাদুর সাহেবের লণ্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ। চৌধুরী সাহেব সহাস্যে বলেন—নেমে এসো বাবা।

মুরাদ বেশি বনহুর মাথার ক্যাপটা আরও কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ছিল।

মুরাদবেশী বনহুরের চালচলন দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলেন চৌধুরী সাহেব তবু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার আব্বা এলেন না কেন?

বনহুর বলে ওঠে—হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারলেন না।

ব্যথিত কণ্ঠে বলেন চৌধুরী সাহেব-বড় আফসোসের কথা। তিনিই যে আজ আমার এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ অতিথি।

দুঃখিতভাবে বলেন বনহুর—আব্বার অসুস্থতার জন্যই এত বিলম্ব হলো।

এসো বাবা।

চৌধুরী সাহেব মুরাদবেশী বনহুরকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন এবং দুঃখের সাথে বলেন-একটা দুঃসংবাদ, আমার বিশিষ্ট বন্ধু খান বাহাদূর সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আসতে পারলেন না। তাঁর পুত্র মুরাদ এসেছে।

কক্ষের সকলেই মুরাদবেশী বনহুরের মুখে তাকালেন। মনিরাও তাকালো, বান্ধবীরা তাকে নিয়ে আলাপ-ঠাট্টা শুরু করলো, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো মনিরা।

চৌধুরী সাহেব সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন—উনি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

বনহুর হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলো।

আর ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

বনহুর তাঁর সাথে হ্যাণ্ডশেক করে বলেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি, মিঃ রাও।

আর ইনি রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়।

রায়বাহাদুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন বনহুর— উনি আমার পরিচিত।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে রায়বাহাদূর শ্যামাচরণ বলে উঠেন—এ্যাঁ। এই কণ্ঠ যেন তার কাছে পরিচিত বলে মনে হলো, কিন্তু স্মরণ করতে পারলেন না, এ কণ্ঠ কোথায় তিনি শুনেছিলো।

বনহুর রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়কে ভাববার সময় না দিয়ে বলে ওঠে—মানে আপনার সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত— আব্বার মুখে প্রায়ই আপনার কথা শুনেছি।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ আশ্বস্ত হন।

চৌধুরী সাহেব সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মুরাদবেশী বনহুরের পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর মনিরার সঙ্গে—এটা আমার ভাগনী মনিরা।

মনিরা! নামটা শুনতেই চমকে উঠলো বনহুর। এ নামটা যেন তার বহু পরিচিত। ভাল করে তাকালো সে মনিরার দিকে। মনিরার অপূর্ব সৌন্দর্য বনহুরকে মুগ্ধ করে ফেললো। মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলো সে।

চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো বনহুরের—বসো বাবা, বসো।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো, কিন্তু মনের কোণে একটা ধাক্কা খেতে লাগলো—মনিরা কে এ মনিরা— সে মনিরা... যার ছবি এখনও তার গলায় লকেটে রয়েছে। না, না, তা হতে পারে না, কত মেয়ের নামই তো মনিরা হতে পারে!

মনিরাকে বান্ধবীরা ধরে বসলো গান শুনাবার জন্য। অগত্যা মনিরা অর্গানের পাশে গিয়ে বসলো।

গান শেষে করতালিতে ভরে উঠলো উৎসব কক্ষ। চৌধুরী সাহেব হীরার আংটি পরিয়ে দিল মনিরার হাতে।

সকলের অজ্ঞাতে বনহুরের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলে খাবার দেয়া হলো।

খাওয়া-পর্ব শেষ হবার পর বিদায়ের পালা। মুরাদবেশী বনহুর উঠে দাঁড়ালো। চৌধুরী সাহেবের সংগে হ্যাণ্ডশেক করার পর হাত বাড়ালো পুলিশ ইন্সপেক্টার হারুনের দিকে, তারপর মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে নিজের গাড়িতে চেপে বসলো।

তারপর সকলেই এক এক করে বিদায় গ্রহণ করলেন। চৌধুরী সাহেব সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে হলঘরে ফিরে এলেন। হঠাৎ নজর গিয়ে ছিল সম্মুখের টেবিলে। একটা নীল রঙের খাম পড়ে রয়েছে। চৌধুরী সাহেব খামখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। একখানা নীল রঙের কাগজের টুকরো বেরিয়ে এলো। তিনি আলোর সামনে কাগজখানা মেলে ধরতেই চমকে উঠলেন, সেটাতে লেখা রয়েছে মাত্র ক'টি শব্দ।

"আপনাদের উৎসবে আমি এসেছিলাম।"

—দস্যু বনহুর

মুহূর্তে চৌধুরী সাহেবের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। মনিরা এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—ওটা কি মামুজান?

কাগজখানা মনিরার হাতে দিয়ে বলেন চৌধুরী সাহেব—পড়ে দেখ।

মনিরা কাগজখানা হাতে নিয়ে দৃষ্টি ফেলতেই অস্ফুট শব্দকরে উঠলো—দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, সে এসেছিল!

দস্যু বনহুর তাহলে সত্যিই এসেছিল, মামুজান?

না, এলে এ চিঠি এলো কোথা থেকে....

চৌধুরী সাহেবের কথা শেষ হতে না হতে গাড়ি-বারান্দা থেকে মোটরের শব্দ ভেসে এলো। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলেন চৌধুরী সাহেব। না জানি এত রাতে আবার কে এলো? গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছতেই আশ্চর্য হলেন। এ যে খান বাহাদুর সাহেবের গাড়ি। তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে দেখলেন, গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছেন খান বাহাদুর হামিদুল হক এবং ড্রাইভার আসনে একটা যুবক।

চৌধুরী সাহেব আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন—হক সাহেব আপনি এসেছেন? আসুন, আসুন।

খানবাহাদুর ও তাঁর পুত্র মুরাদ গাড়ি থেকে নেমে ছিল।

চৌধুরী সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ আপনার কি অসুখ হয়েছিল?

খানবাহাদুর সাহেব বলেন—চলুন সব বলছি।

চৌধুরী সাহেব ওদের সংগে করে হলঘরে প্রবেশ করলেন। খানবাহাদুর সাহেব ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়েন। মুরাদও বসে পড়ে আর একটা সোফায়।

চৌধুরী সাহেব বলেন—আপনি হঠাৎ নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কি হয়েছিল?

কে বলেন আমি অসুস্থ হয়েছিলাম?

আপনার পুত্র মুরাদের মুখে জানতে পারলাম...

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন হক সাহেব—আমার পুত্র মুরাদ?

জ্বি হ্যাঁ, কিছু পূর্বে সে চলে গেছে।

আপনি এসব কি বলছেন চৌধুরী সাহেব? আমার পুত্র মুরাদ এই তো আমার পাশে বসা, ও তো এর আগে এ বাড়িতে কোনদিন আসেনি।

একসঙ্গে চৌধুরী সাহেব আর মনিরা চমকে উঠে তাকালো পাশের সোফায় উপবিষ্ট যুবকের মুখের দিকে চেয়ে।

চৌধুরী সাহেব ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন—কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার গাড়ি নিয়ে যে যুবক এসেছিল, সে তবে আপনার পুত্র মুরাদ নয়?

না না, সে আমার পুত্র নয়, সে ডাকু..

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে চৌধুরী সাহেব—ডাকু। সে যুবকই তাহলে দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, সে যুবকই দুস্য বনহুর—তারপর হক সাহেব সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।

সব শুনে চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলো। এখন তাহলে উপায়, নিশ্চয়ই দস্যু হানা দেবার পূর্বে অনুসন্ধান নিয়ে গেল। চিন্তিতকণ্ঠে বলেন—এক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করে দিই, সমস্ত কথা তাঁদের জানানো উচিত।

চৌধুরী সাহেব আর বিলম্ব না করে তখনই পুলিশ অফিসে ফোন করলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন কয়েকজন পুলিশসহ পুনরায় চৌধুরীবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

চৌধুরী বাড়ি এসে সমস্ত ঘটনা শুনে থ' মেরে গেল। এত বড় কথা। যে দস্যু সন্ধানে পুলিশমহলের কারও চোখে ঘুম নেই, অহরহ যার খোঁজে তারা হন্তদন্ত হয়ে শহরময় ছুটাছুটি করে মরছে, সে দস্যু বনহুর তাদের পাশে বসে একসঙ্গে খাবার খেয়ে গেল, এমন কি হাতে হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডশেক পর্যন্ত করে গেল। ছিঃ ছিঃ, এর চেয়ে লজ্জার কথা কি হতে পারে। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের চোখে পর্যন্ত ধূলি দিয়ে ছেড়েছে সে। এখন আর কি আছে, কয়েকজন পুলিশকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখে ফিরে এলেন।

❑

নিশীথ রাত।

গোটা বিশ্ব সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

বনহুরের অশ্ব চৌধুরীবাড়ির পেছনে এসে থামলো। তার শরীরে কালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, মুখে কালো রুমাল বাঁধা।

আজ ক'দিন থেকে চৌধুরীবাড়ির কারও চোখে ঘুম নেই। চৌধুরী সাহেব স্বয়ং গুলিভরা রিভলবার হাতে হলঘরে পায়চারী করে করে রাত কাটান। মরিয়ম বেগমের চোখেও ঘুম নেই। গোটা রাত তাঁর অনিদ্রায় কাটে। শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেন। হীরার আংটির জন্য তাঁর কোন চিন্তা নেই, চিন্তা যত মনিরাকে নিয়ে দস্যু বনহুর হঠাৎ কিছু না অমঙ্গল ঘটিয়ে বসে।

মনিরা নিজের কক্ষে শুয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ঘুমাতে গিয়ে চমকে ওঠে সে। না জানি কোন মুহূর্তে তার হীরার আংটি লুটে নেবে হয়ত তাকে জীবনে মেরে ফেলতেও পারে। দস্যুর অসাধ্য কিছু নেই। ভয়ভীতি নিয়ে প্রহর গুণে মনিরা, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

মনিরা হীরার আংটি আংগুলে রাখার সাহস পায়নি। আলমারীতে রেখে তালাবন্ধ করে দিয়েছে। দস্যু হানা দিলে হীরার আংটি নিয়ে যাবে, তবু তার শরীরে যেন আঘাত না পায়।

আজ ক'দিন হলো মনিরা ঘুমায়নি, তাই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে আজ মনিরা।

হলঘর থেকে চৌধুরী সাহেবের জুতোর শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে মরিয়ম বেগমের চুড়ির টুনটান শব্দ। সদর গেটে সশস্ত্র পুলিশ দণ্ডায়মান।

জানালার শার্সী খুলে কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর। ধীরে ধীরে অতি লঘু পদক্ষেপে মনিরার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মনিরার নাকের সামনে ধরলো তারপর মনিরার বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা বের করে নিয়ে এগিয়ে চলে আলমারীর দিকে। অল্পক্ষণেই আলমারী খুলে বের করে আনে সে বহু মূল্যবান হীরার আংটি।

কক্ষে একটা নীলাভ ডিমলাইট জ্বলছিল, সে আলোতে বনহুরের হাতে হীরার আংটিটা ঝক্‌ঝক্ করে উঠে। আংটিটা প্যান্টের পকেটে রেখে এগিয়ে যায় সে মনিরার বিছানার পাশে। ছিন্নলতার ন্যায় মনিরার সুকোমল দেহখানা বিছানায় লুটিয়ে আছে। এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে। অপূর্ব দেখাচ্ছিল মনিরাকে। বনহুর নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর চলে যাবার জন্য যেমনি সে ফিরে দাঁড়াতে যায়, অমনি নজর গিয়ে পড়ে তার দেয়ালের ওপর। বিস্ময়ে চমকে ওঠে বনহুর। একি! এ তারই লকেটের ছবি। পাশাপাশি দুটি মুখ, সে আর মনিরা। আশ্চর্য! এ ছবি এখানে এলো কি করে? বনহুর নিজের গলার মালাছড়া জামার নিচে হতে টেনে বের করলো, তারপর লকেটের ঢাকনা খুলে ফেললো। একবার তাকালো সে দেয়ালের ছবিখানার দিকে তারপর পকেটে। এ যে একই ছবি! না, কোন ভুল নেই। তবে কি এই তার সে মনিরা, যে মনিরা শিশুকালে তার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল? বনহুর ঝুঁকে ছিল মনিরার মুখের ওপর। এইতো সে তিলটা এখনও রয়েছে তার চিবুকের একপাশে। লকেটের ছবিখানার দিকে লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হলো সে, এই তার সে মনিরা। আনন্দে বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফিরে পেয়েছে সে, তার মনিরাকে তাহলে ফিরে পেয়েছে। বনহুর বসে ছিল মনিরার পাশে, সযত্নে মনিরার ললাট থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলো। কতদিন, কত যুগ পরে সে যেন ফিরে পেল তার মনিরাকে। বনহুরের ঠোঁট দু'খানা মনিরার ললাট স্পর্শ করলো।

এবার বনহুর মনিরার সুকোমল হাতখানা তুলে নিল হাতে, তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বের করে আনলো হীরার আংটিটা, অতি যত্নে পরিয়ে দিল সে মনিরার আঙ্গুলে।

একটুকরা কাগজ বের করে তাতে লিখল—

"আমি এসেছিলাম" — দস্যু বনহুর।

কাগজখানা মনিরার বিছানার পাশে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

❑

বনহুরের অশ্ব গিয়ে থামতেই ছুটে এলো নূরী। বনহুরকে হাত ধরে নামিয়ে নিল সে! তারপর হেসে বলেন— এনেছো আমার হীরার আংটি?

চলতে চলতে বলে বনহুর— আনতে পারলাম না, একজন কেড়ে নিল।

মিথ্যা কথা। দস্যু বনহুরের কাছ হতে কেউ যে কিছু কেড়ে নিতে পারবে— এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে।

কেন? আমার চেয়ে কেউ কি বীরপুরুষ নেই?

না, আমার কাছে সব পুরুষের চেয়ে তুমিই শক্তিমান।

নূরীর কথায় হাসলো বনহুর। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন- তোমার এ বিশ্বাস অটুট রইলো কই! হীরার আংটি হাতে পেয়েও তোমার নিকট পৌঁছাতে পারলাম না।

নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাত চেপে ধরলো সত্যি তুমি হীরার আংটি হাতে পেয়েও---

হ্যাঁ নূরী, আমি পরাজিত হয়েছি।

না না, এ আমি বিশ্বাস করি না হুর, এ আমি বিশ্বাস করি না---

নূরী, সামান্য একটা হীরার আংটি তোমাকে এতখানি মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে?

না হুর, শত শত হীরার আংটি আমার কাছে তুচ্ছ। আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনে দস্যু বনহুরকে কেউ পরাজিত করতে পারে। তুমি সত্যি করে বল, কারও কাছে তুমি হেরে যাওনি?

নূরী, তোমার বিশ্বাস যেন অটুট থাকে। ইনশাআল্লাহ বনহুর কারও কাছে শক্তির দিক দিয়ে পরাজিত হবে না।

নূরী আনন্দে অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে—হুর!

নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। নূরী তার শরীর থেকে দস্যুর ড্রেস খুলে নেয়, তারপর উভয়ে বসে পড়ে পাশাপাশি। নূরী বনহুরের চুলে

আংগুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—হুর, তুমি সত্যি বীরপুরুষ। তোমার শক্তির কাছে সমস্ত লোক পরাজিত, তোমার বুদ্ধির কাছে সবাই হেয়! হাজার হাজার লোকের চোখে ধূলো দিয়ে তুমি তোমার সাধনা পূর্ণ করে চলেছো। শত শত পুলিশবাহিনী তোমাকে পাকড়াও করার জন্য অহরহ ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটাছুটি করছে। কেউ তোমাকে আজও পাকড়াও করতে সক্ষম হলো না। তোমার এই ভূতপূর্ব বীরত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি। খোদা তোমাকে চিরদিন এমনি করে জয়ী করুন।

নূরী, তুমিই শুধু আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আর কেউ আমার মঙ্গল কামনা করে না। সবাই চায় দস্যু বনহুরের পতন!

ছিঃ! ও কথা মুখে এনো না হুর; আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তোমার অমঙ্গল আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টদায়ক।

বনহুর অবাক নয়নে তাকালো নূরীর অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টির দিকে। নূরী তাকে এত ভালবাসে কিন্তু ধীরে ধীরে নূরীর মুখ খানা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ভেসে ওঠে একটা সুন্দর ফুলের মত কোমল ঘুমন্ত মুখ। বনহুর দৃষ্টি নত করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

নূরী বলেন—হুর, আজ তোমাকে যেন কেমন ভাবাপন্ন লাগছে। কি হয়েছে তোমার?

বললাম তো কিছু না। তুমি যাও নূরী, আমি এখন বিশ্রাম করবো।

কেন, আমি থাকলে তোমার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে? আমি যাই। অভিমান ভরে উঠে দাঁড়ায় নূরী।

অন্যদিন হলে বনহুর ওর হাত চেপে ধরে পুনরায় বসিয়ে দিত কিংবা নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে বলত—চলো আমিও যাই তোমার সঙ্গে, কিন্তু আজ বনহুর নীরব থেকে যায়।

নূরীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় সে।

বনহুর বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে বুজে আসে ওর চোখের পাতা।

আড়ালে দাঁড়িয়ে নূরী তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখে। বনহুরকে নিয়ে সে রচনা করে চলেছে এক স্বপ্নসৌধ। নূরীর মন চলে যায় দূরে, অনেক দূরে—সেখানে শুধু সে আর বনহুর। কিন্তু বনহুরকে সে যতই আঁকড়ে ধরতে চায়, ততই যেন সে সরে পড়ে দূরে। কিছুতেই নূরী বনহুরের নাগাল পায় না। বিগত দিনের স্মৃতি হাতড়ে চলে নূরী। কিন্তু সেখানেও ফাঁকা লাগে,

বনহুরের নাগাল সে কোনদিন পায়নি। কোথায় যেন ব্যবধান আছে দু'জনের মধ্যে।

আর ভাবতে পারে না নূরী, সমস্ত ভাবনা যেন তার খাঁই হারিয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে চলে যায় সে নিজের ঘরে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে নূরী কত কথা, সে ছোট্ট হতে এত বড় পর্যন্ত। সব সময় সে বনহুরকে দেখে আসছে। এক সঙ্গে খেলা করেছে, এক সঙ্গে খেয়েছে, ঝর্ণায় সাঁতার কেটেছে, কিন্তু কৈ, বনহুরকে সে তো কোনদিন নিজের করে পায়নি। ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে ওঠে নূরীর মন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। বিশেষ করে আজকের কথাটা তার হৃদয়ে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী, হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেংগে যায় তার, দেখতে পায় তার কক্ষের জানালার শিক বাঁকিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছে একটা হিংস্র বাঘ। অন্ধকারে বাঘের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মাত্র আর একটা শিক বাঁকাতে পারলেই বাঘটা তার কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

নূরী ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো।

পাশের কক্ষে ঘুম ভেংগে গেল বনহুরের। নূরীর কক্ষ লক্ষ্য করে ছুটে চললো সে। কিন্তু পূর্বেই বাঘটা জানালার শিক ভেংগে কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই বাঘটা লাফিয়ে ছিল তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পড়ে গেল মাটিতে। নূরী আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ ঢাকলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে নিজের কোমর থেকে ছোরা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল বনহুরের দিকে। বনহুর ছোরাখানা লুফে নিয়ে বসিয়ে দিল বাঘটার বুকে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো বাঘ আর বনহুরের মধ্যে।

ততক্ষণে কক্ষে আরও বহু দস্যু এসে জড়ো হয়েছে। বাঘটা তখন ঢলে পড়লো মেঝেতে। বনহুর গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তার শরীরে কয়েকটা স্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে দরদর করে ।

নূরী এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না, ছুটে এসে দু'হাতে নিজের ওড়নার কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিতে লাগলো ওর ক্ষত স্থানগুলো। অন্যান্য দস্যু বনহুরের এই বীরত্বে আশ্চর্য হয়ে যায়! তারা ভাবতেও পারেনি তাদের সর্দার এত বড় একটা বাঘকে একাই সাবাড় করতে পারবে। সবাই বনহুরের জয়ধ্বনি করে ওঠে।

❑

ভোরে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে তাকালো মনিরা। মুক্ত জানালা দিয়ে ভোরের মিষ্টি হাওয়া তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। হাই তুলে উঠে বসলো সে। হঠাৎ তার নজর ছিল হাতের আংগুলে। একি! হীরার আংটি তার আংগুলে এলো কি করে? সে যে আলমারীতে উঠিয়ে রেখেছিল আংটিটা! তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় হাত দিয়ে চাবি গোছা নিতে যায়, কিন্তু কোথায় চাবির গোছা! আলমারীর কপাটে চাবির গোছা ঝুলছে!

মনিরার বেশ স্মরণ আছে, শোবার পূর্বেও সে বালিশের তলায় চাবির গোছা হাত দিয়ে অনুভব করে নিয়ে তবেই শুয়েছে। তবে কি ঘরে কেউ এসেছিল? দরজার দিকে তাকালো সে। দরজা যেমন খিল দিয়ে আটকানো ছিল, ঠিক তেমনি আছে। ঘরে তাহলে কেউ আসেনি। মনিরা ধড়মড় করে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, অমনি তার নজর গিয়ে পড়ে বিছানার পাশে একটা কাগজের টুকরা পড়ে আছে। কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে এলো—দস্যু বনহুর এসেছিল!

ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে পুনরায় তাকালো সে নিজের আংগুলে। দস্যু বনহুর তাহলে হীরার আংটি গ্রহণ না করে তার আংগুলে পরিয়ে দিয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য কি? অপমান, ঘৃণায় রি রি করে উঠলো মনিরার শরীর। কেন সে হীরার আংটি নিয়ে গেল না, কেন সে তাকে স্পর্শ করলো? এতই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি করে সে এক কথা মামুজান আর মামীমার কাছে বলবে। একটা দস্যু তার আংগুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে যাবে—!

মনিরা দরজা খুলে মামীমার কক্ষে প্রবেশ করলো।

মরিয়ম বেগম কন্যা-সমতুল্যা ভাগ্নীকে হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মনিরা?

মনিরা ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলেন—এই দেখ মামীমা, আমার হীরার আংটি আলমারীতে রেখেছিলাম, কিন্তু রাতে আমার হাতের আংগুলে এসে পড়েছে।

কি আশ্চর্য কথা, এসব কি বলছিস তুই?

সত্যি মামীমা আলমারীতে হীরার আংটি বন্ধ করে রেখে ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু ভোরে দেখি হীরার আংটি আঙ্গুলে, আর চাবির গোছাও বালিশের তলায় নেই, আলমারীর গায়ে ঝুলছে।

সর্বনাশ, এ যে অদ্ভুত কথা!

এই দেখ—বনহুরের লেখা কাগজখানা মরিয়ম বেগমের হাতে দেয় মনিরা—এটা পড়ে দেখ।

কাগজখানা হাতে নিয়ে দৃষ্টি বুলাতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মরিয়ম বেগম—একি, দস্যু বনহুর এসেছিল।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগমের আর্তচিৎকার শুনে ছুটে আসেন চৌধুরী সাহেব—কি হলো, কি হলো?

ওগো, দস্যু হানা দিয়েছিল .....

দস্যু!

হ্যাঁ, দস্যু বনহুর মনিরার কক্ষে হানা দিয়েছিল।

হীরার আংটি নিয়ে গেছে?

না গো, না।

তাহলে সে হীরার আংটি নিতে পারেনি?

নিয়েও নেয়নি।

তার মানে?

এবার বলে মনিরা—মামুজান, রাতে শোবার পূর্বে আংটি খুলে আলমারীতে বন্ধ করে চাবির গোছাটা বালিশের তলায় রেখেছিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আংটিটা আমার হাতের আংগুলে এসে গেছে, চাবির গোছা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে নেই, আলমারীর গায়ে ঝুলছে। বিছানায় পড়ে আছে এই কাগজের টুকরাটা, পড়ে দেখ মামুজান।

কাগজের টুকরাখানায় নজর বুলিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়েন চৌধুরী সাহেব। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বলেন— এত সতর্কতার মধ্যেও সে আসতে পারলো! হলঘরে আমি, বাড়ির ভিতরে বন্দুকধারী পাহারাদার, সদর গেটে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। এর মধ্যেও দস্যু বনহুর হানা দিতে পারলো? হীরার আংটি নেয়নি সে, কিন্তু এমন কিছু নিয়ে গেছে, যা হীরার আংটির চেয়েও মূল্যবান। দেখ দেখি, আমার ঘরের সিন্দুকটা।

সকলে ছুটলো চৌধুরী সাহেবের শোবার ঘরে। সে ঘরের জিনিসপত্র যেটা যেখানে সে রকমই আছে, সিন্দুকের পাশেও কেউ যায়নি। আশ্বস্ত হলেন চৌধুরী সাহেব।

মরিয়ম বেগম বলেন—দস্যু বনহুর হানা দিয়ে কিছু না নিয়েই চলে গেল, সত্যি বড় আশ্চর্যের কথা।

হ্যাঁ, অদ্ভুত ব্যাপার, যাক পুলিশ অফিসে ফোন করছি— বলেন চৌধুরী সাহেব।

মনিরা বলে ওঠে—কি দরকার মামুজান, সে যখন কোন অন্যায় করেনি, তখন অযথা এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি?

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন—না মনিরা, তা হয় না। বাড়িতে আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। শয়তানটা সুযোগ বুঝে আবার সর্বনাশ করে বসবে। হায় একি হলো, দস্যু বনহুরের নজর শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপর এসে পড়ল। ওগো, তুমি পুলিশকে সব জানিয়ে আরও পাহারার ব্যবস্থা করো। আমি যে আর ভাবতে পারছি না। মরিয়ম বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

❑

স্বামীকে খেতে দিয়ে বলেন মরিয়ম বেগম—ওগো, সেদিন মনিরার জন্ম-উৎসবে খানবাহাদুর সাহেব আর তাঁর ছেলে মুরাদ ঠিকভাবে যোগ দিতে পারেননি, হঠাৎ এ দস্যুটা কি কাণ্ডই না করেছিল, আর একদিন ওদের দাওয়াত করে এসো না?

খেতে খেতে বলেন চৌধুরী সাহেব—ঠিক বলছো। সে কথা আমার মনেই ছিল না। আজই আমি ফোন করে দেব, কাল বিকেলে তাঁরা যেন আসেন।

হ্যাঁ, তাই কর। কিন্তু কেবল ফোন করলে হবে না, তুমি নিজে গিয়ে দাওয়াত করে এসো। যা হউক দু'দিন পর মনিরাকে যখন মুরাদের হাতে স'পে দিতে হবে, তখন আগে থেকে ওদের মধ্যে একটা আলাপ-পরিচয় হওয়া ভাল।

তাহলে আমিই যাব?

আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিরা মামুজান আর মামীমার কথা শুনে। কি জানি কেন যেন ভালো লাগে না মনিরার। সেদিন সে মুরাদকে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কৈ তার মনের কোণে ওর ছবি তো রেখাপাত করেনি? কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি মনিরা হৃদয়ে। ধীরে ধীরে মনিরা চলে যায় নিজের কক্ষে। বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, তাকায় সে ছবিখানার দিকে। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে মনিরা। কি সুন্দর দুটি চোখ, অপূর্ব অদ্ভুত! মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, সত্যই কি মনির নদীর স্রোতে ভেসে গেছে, মারা গেছে সে? না না, সে হয়তো বেঁচে আছে, মস্ত বড় যুবক

হয়েছে সে, আরও সুন্দর হয়েছে হয়তো কিন্তু কি করে তা হতে পারে। গভীর পানিতে ক্ষুদ্র একটা বালক কি করে বাঁচতে পারে? মনিরার মন যেন ডেকে বলে সে বেঁচে আছে, নইলে তার লাশ পাওয়া যেত। গভীর চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় মনিরা।

❑

খানবাহাদুর সাহেব আর মুরাদকে দাওয়াত করে এসেছেন চৌধুরী সাহেব। আজ বিকেলে আসবেন তাঁরা। মরিয়ম বেগম স্বহস্তে পাকশাক করছেন। চৌধুরী সাহেবের ব্যস্ততার সীমা নেই।

মরিয়ম বেগমের পাক শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এলো। তিনি ছুটলেন মনিরার কক্ষে। তার চুল বাঁধা, কাপড় পরা শেষ হলো কিনা দেখতে, কিন্তু মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হলেন তিনি। মনিরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে বালিশের উপরে! একখানা অপরিপাটি কাপড় পরনে। মরিয়ম বেগম রাগতকণ্ঠে বলেন—মনিরা, একি, এখনও তুমি শুয়ে আছ? ওঁদের যে আসার সময় হলো? বই থেকে মুখ না তুলেই বলে মনিরা—কাদের আসার সময় হলো মামীমা?

সে কি, খানবাহাদুর সাহেব আর তাঁর ছেলে মুরাদ আসবে যে!

তাতে আমার কি?

আশ্চর্য করলি মনি, তাতে তোর কি, তা জানিসনে?

না তো? বই রেখে উঠে বসে মনিরা।

মুরাদের মত এত উচ্চশিক্ষিত ছেলেকে কেন আমরা এত সমাদর করছি, এ কথা খুলে বলতে হবে তোকে?

বুঝেছি, আমি তোমাদের গলগ্রহ হয়েছি।

ছিঃ ছিঃ! ওসব কি বলছিস মনি!

হ্যাঁ মামীমা, আমি তোমাদের চোখের বালি হয়ে পড়েছি। নইলে তোমরা আমাকে তাড়ানোর জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছো কেন?

মরিয়ম বেগম মনিরার পাশে এসে বসে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন—আমরা তোমাকে তাড়ানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছি, এসব কি বলছো মনিরা? লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ছাড়া আর কে আছে এই বুড়ো-বুড়ীর?

তবে যে সব সময় বিয়ে আর বিয়ে করে ব্যস্ত হচ্ছো?

পাগলী মেয়ে! এখন বড় হয়েছো, বিয়ে করতে হবে না?

না, আমি বিয়ে করবো না।

তা হয় না মনি, মেয়েছেলে কোনদিন বাপ-মার ঘর আগলে থাকতে পারে না। কথাটা একটু কঠিন কণ্ঠেই বলেন মরিয়ম বেগম।

মনিরাও অভিমানভরা গলায় বলে—মামীমা, তোমাদের ঘর আগলে থাকতে চাইনে। আমি বিয়েও করতে চাইনে।

মনিরা তুমি কচি খুকি নও। বয়সও তোমার কম হয়নি। সব বুঝতে শিখেছ, মুরাদের মত একটা সর্বগুণে গুণবান ছেলেকে হেলায় হারাতে পারি না। তুমি কাপড়-চোপড় পরে নিচে নেমে এসো।

এমন সময় চৌধুরী সাহেব কক্ষে প্রবেশ করেন—একি মা মনি এখনও তোমার হয়নি। লক্ষ্মী মা আমার, চট করে জামাকাপড় পরে নাও।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে গেল। চৌধুরী সাহেব কন্যা-সমতুল্য ভাগনীকে আদর করে আরও বলেন—তারপর নেমে গেল নিচে।

মামুজান আর মামীমা বেরিয়ে যেতেই পুনরায় বইখানা মেলে ধরে মনিরা চোখের সামনে। কিন্তু মন আর বসে না, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে। বই রেখে উঠে পড়ে, কিছুক্ষণ মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে। শুভ্র বলাকার মত ডানা মেলে সাদা সাদা মেঘগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, সে দিকে তাকিয়ে কত কথা ভাবে সে।

হঠাৎ নিচে গাড়ি-বারান্দা থেকে ভেসে আসে মোটরগাড়ির শব্দ! মনিরা বুঝতে পারে, খান বাহাদুর এবং তার পুত্র মুরাদ পৌঁছে গেছেন। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনিরা ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে। ড্রেসিংরুম থেকে যখন মনিরা বাইরে বেরিয়ে এলো তখন তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। নিচে নেমে আসতেই শুনতে পেল চৌধুরী সাহেব বলছেন—ঠিক কথাই বলছেন খান বাহাদুর সাহেব, শুভ কাজ যতো শীঘ্র হয় ততোই ভালো। মনিরাকে যখন আপনার এত পছন্দ তখন—কথা শেষ হয় না চৌধুরী সাহেবের, মনিরাকে দেখতে পেয়েই সহাস্যে বলেন—এই যে মা মনি এসে গেছে। এত বিলম্ব করলে কেন মা?

খান বাহাদুর সাহেবও চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন—কখন থেকে আমরা তোমার প্রতীক্ষা করছি মা বসে বসে।

মুরাদ সেদিন এভাবে মনিরাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি, আজ মনিরাকে দেখে মুগ্ধ হলো সে। উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবী কায়দায় মনিরাকে সম্ভাষণ জানালো।

মনিরা কোন উত্তর না দিয়ে একটা সোফায় বসে ছিল।

এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ হলো।

মুরাদ এক সময় বলে বসলো—চলুন না মিস মনিরা, একটু বেড়িয়ে আসি।

চৌধুরী সাহেব বলে ওঠেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, যাও মা একটু বেড়িয়ে এসো!

মনিরা মৃদুকণ্ঠে বলেন—মামুজান, আজ আমার শরীর ভালো নেই।

খান বাহাদুর সাহেব হেসে বলেন—বাইরের হাওয়াতে শরীর সুস্থ বোধ হবে, যাও মা যাও।

মরিয়ম বেগমও তাদের সঙ্গে যোগ দিল—মুরাদ যখন বলছে, তখন যাও মনিরা!

মনিরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো।

মুরাদ খুশি হলো। আনন্দসূচক শব্দ করে বলেন—থ্যাঙ্ক ইউ, চলুন মিস মনিরা।

ড্রাইভ আসনের দরজা খুলে ধরে বলে মুরাদ—উঠুন।

মনিরা তার কথায় কান না দিয়ে পেছনের আসনে উঠে বসলো।

মুরাদ মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেও মুখোভাবে তা প্রকাশ না করে ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

মুরাদ সিগারেট থেকে একরাশ ধোয়া পেছন সিটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—এখন কি সুস্থ বোধ করছেন?

মনিরা সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন—চলুন কোথায় যাব।

মৃদু হাসলো মুরাদ—কোথায় যেতে ইচ্ছে বলুন তো? ক্লাবে, না লেকের ধারে।

ক্লাবে আমি যাই না।

কেন? বাঙ্গালী মেয়েদের যত গোঁড়ামি। বিশ্রী ব্যাপার! বিলেতে কিন্তু এসব নেই। চলুন লেকের ধারেই যাওয়া যাক।

লেকের ধারে এসে মুরাদের গাড়ি থেমে ছিল। নেমে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ধরে বলেন— আসুন।

মনিরা নেমে চলতে শুরু করলো।

লেকের ধারে গিয়ে বসে ছিল মনিরা। মুরাদও বসলো তার পাশে, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো সে।

মনিরা বিরক্তি বোধ করলো, সরে বসলো সে।

মুরাদ হেসে বলেন—মিস মনিরা, আমি বুঝতে পারিনে এ দেশের মেয়েরা এত লজ্জাশীলা কেন—আমি বিলেতে সাত বছর কাটিয়ে এলাম কিন্তু কোন মেয়ের মধ্যে এমন জড়তা দেখলাম না, ওরা যে কোন পুরুষের সঙ্গে প্রাণখোলা ব্যবহার করতে পারে।

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—মিঃ মুরাদ, আমি সেজন্য দুঃখিত। মেয়েদের অত স্বাধীনতা আমি পছন্দ করিনে।

ছিঃ ! ছিঃ আপনি দেখছি একদম সেকেলে ধরনের! মেয়েরাই তো আজকাল দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে আনছে। তারা এখন পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শিখেছে, তাইতো দেশ ও জাতির এত...

মুরাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—তাইতে দেশ ও জাতির এত অবনতি।

অবনতি! এ আপনি কি বলছেন মিস মনিরা?

হ্যাঁ মিঃ মুরাদ, বিশেষ করে আমার চোখে।

তার মানে?

মানে মেয়েরা আজকাল বিলেতী চাল ধরেছে! বিলেতী চাল চালতে গিয়ে এত অধঃপতনে নেমে গেছে তারা, যা বলার নয়। এমন সব উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে শুরু করেছে তারা, যা মুসলিম সমাজের কাছে অত্যন্ত হেয়। টেডী পোশাক পরতে গিয়ে মেয়েরা প্রায় উলঙ্গ হয়েই চলাফেরা করছে। আর দু'দিন পর তারা যে আরও কত নিচে নেমে যাবে, ভাবতেও মনে ঘৃণা জন্মে।

মুরাদ আশ্চর্য হয়ে শুনছিল মনিরার কথাবার্তা। হেসে বলেন—মিস মনিরা, আপনি দেখছি বড্ড নীরস ধরনের মেয়ে। টেডী পোশাক মানুষকে কত মানায়, বিশেষ করে মেয়েদের। মিস মনিরা, আপনি এসব অনুভব করতে পারেন না।

আমি অনুভব করতে চাইনে। চলুন, এবার ওঠা যাক।

সেকি! এরি মধ্যে উঠতে চাচ্ছেন? মিস মনিরা, সত্যি আপনার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে! যদিও আপনার মন সেকেলে ধরনের কিন্তু আপনার চেহারা একেলে মেয়েদের চেয়ে অনেক সুন্দর। বিলেতী মেয়েরা কোন্ ছার!

দেখুন আমার সৌন্দর্যের প্রশংসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু পুনরায় আমি একথা শুনতে চাইনে।

মিস মনিরা, অদ্ভুত মেয়ে আপনি। আমি জীবনে বহু মেয়ের সঙ্গে মিশার সুযোগ লাভ করেছি, আপনার মত আশ্চর্য মেয়ে আমি কোনদিন দেখিনি। সে সব মেয়েরা পুরুষের মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।

প্লীজ মিঃ মুরাদ শুনতে চাইনে। উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

মুরাদ চট করে ওর হাত চেপে ধরে—আমি উঠতে দিলে তো উঠবেন! বসুন আমার পাশে।

মনিরা বিরক্ত হয়, তবু বসে পড়ে বলে—সন্ধ্যা হয়ে এলো, মামুজান উদ্বিগ্ন হবেন।

হেসে ওঠে মুরাদ হাঃ হাঃ করে—কি যে বলেন মিস মনিরা, আপনার মামুজান নিশ্চিন্ত আছেন। আসুন, এই সন্ধ্যেটা আমরা লেকের নিরিবিলিতে কাটিয়ে যাই। মনিরার হাত ধরে আকর্ষণ করে মুরাদ।

মুরাদের কণ্ঠস্বর আর মনোভাব বুঝতে পেরে মনে মনে শিউরে ওঠে মনিরা। অস্বস্তি বোধ করে সে। এ জনহীন নির্জন লেকের ধারে একটা জঘন্য যুবকের পাশে মনিরা নিজকে বড় অসহায় মনে করে। সে হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মুরাদের বলিষ্ঠ হাতের মুঠা থেকে কিছুতেই নিজের হাতখানাকে মুক্ত করে নিতে পারে না মনিরা। ঠিক সে মুহূর্তে কোথা হতে একটা তীরফলক এসে বিঁধে গেল মুরাদের পায়ের কাছে মাটিতে।

মুরাদ মনিরার হাত ছেড়ে দিয়ে তাকালো চারদিকে, কিন্তু কোথাও কোন জনপ্রাণী নজরে পড়ে না।

মুরাদ তীরখানা হাতে উঠিয়ে নিতেই দেখতে পায়, সেটাতে এক টুকরা কাগজ আটকানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে। যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু বেশ নজরে পড়ে, কাগজখানায় লেখা আছেঃ

'সাবধান'

—দস্যু বনহুর

মুরাদের হাত থেকে কাগজখানা খসে পড়ল! ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল।

মনিরা বুঝতে পারে নিশ্চয়ই এই কাগজে এমন কিছু আছে, যা মুরাদের মত শয়তানকেও ভীত করে তুলেছে। মনিরার মুখখানাও বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ভয়-জড়িত কণ্ঠে বলে মনিরা—চলুন এবার ফেরা যাক।

ঢোক গিলে বলে মুরাদ—চলুন।

গাড়িতে বসে ভাবে মনিরা, দস্যু বনহুর তাহলে তার পিছু নিয়েছে। কি ভয়ঙ্কর কথা! তবু মনে মনে বনহুরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না সে, বনহুর যদি সে মুহূর্তে ঐ তীর ছুঁড়ে সাবধান করে না দিত তাহলে কি যে হত! মুরাদের কবল থেকে কিছুতেই নিজকে রক্ষা করতে পারতো না। মনে প্রাণে খোদাকে ধন্যবাদ জানায় মনিরা।

গাড়িতে বসে আর কোন কথা হয় না। কারণ ইতোপূবে মুরাদ একবার দস্যু বনহুরের কবলে পড়েছিল। কত ভয়ানক এ দস্যু বনহুর সে জানে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে গাড়ি চালিয়ে চলে সে।

❑

দস্যু বনহুরের আস্তানা।

একটা সুউচ্চ আসনে দস্যু বনহুর উপবিষ্ট। সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান তার অনুচরবৃন্দ। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে সেদিনের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—আজ তোমরা যা লুট করে এনেছো তা গরীব-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করে দাও।

একজন বলে ওঠে—সর্দার, এসব বহুমূল্য দ্রব্য।

হুঙ্কার ছাড়ে বনহুর—আমি যা বললাম তাই করবে।

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—নিয়ে যাও সব।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচর এক একটা ঝোলা কাধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর সোজা চললো বিশ্রামকক্ষে।

কক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী এসে দাঁড়ালো পাশে, অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন—হুর, আজকাল সব সময় তুমি শহরেই পড়ে থাক কেন বলত?

যখন যেখানে কাজ, সেখানেই থাকি।

তা বলে তুমি আমাকে একা ছেড়ে------

তা'ছাড়া তো কোন উপায় নেই নূরী।

হুর, তুমি না থাকলে আমি বড্ড কষ্ট পাই।

মিছেমিছি কষ্ট পাও কেন বলতো? নাসরীন আছে, সায়রা আছে, রুখসানা আছে...,.

হাজার জন থাক, তবু তোমার অদর্শন অসহনীয় হুর।

নূরী !

হুর তুমি আমার, বলো তুমি আমাকে ভালবাস? বলো, চুপ করে রইলে কেন, বলো?

বাসি।

সত্যি! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে খুশির আবেগে উঠে দাঁড়ায় নূরী, তারপর হেসে বলে—হুর, অনেকদিন হলো তুমি আমার নাচ দেখতে চাওনা, আজ দেখবে?

যদি তোমার ইচ্ছে হয়, নাচো।

নূরী মনের আনন্দে নাচতে শুরু করলো।

বনহুর আনমনে তাকিয়ে রইলো নূরীর দিকে।

এমন সময় দরজার বাইরে থেকে ডাকলো একজন অনুচর—সর্দার!

কে রহমান? এসো।

নূরীর নাচ থেমে যায়, কক্ষে প্রবেশ করে রহমান—সর্দার!

বলো কি খবর?

সর্দার, পুলিশবাহিনী রহমতকে গ্রেপ্তার করেছে।

বলো কি!

হ্যাঁ সর্দার। আমরা যখন বন্ধনী সেতু পার হচ্ছিলাম, তখন পুলিশ ফোর্স আমাদের ঘেরাও করে ফেলে এবং তুমুল লড়াইয়ের পর আমাদের একজনকে নিহত আর রহমতকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশবাহিনীর দু'জন নিহত হয়েছে।

হুঁ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তোমরা যে ঐ পথে যাবে, একথা পুলিশবাহিনী জানতে পারলো কি করে?

সে কথা আমি জানি না সর্দার।

এবার গর্জে উঠলো বনহুর—তোমরা রহমতকে উদ্ধার না করে ফিরে এলে কেন?

সর্দার, প্রত্যেকটা পুলিশের হাতে গুলিভরা রাইফেল ছিল। তা'ছাড়া---

আমি কোন কথা শুনতে চাইনে, কেন তোমরা তাকে না নিয়ে ফিরে এলে, বলো?

সর্দার! ভীত কণ্ঠস্বর রহমানের।

এমনি কি তারা রহমতকে নিয়ে শহরে পৌঁছে গেছে?

না সর্দার, এখনও তারা পৌঁছতে পারেনি, রহমত গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসেছি।

যাও তাজকে প্রস্তুত করো, আমি এক্ষণি যাব।

বেরিয়ে যায় রহমান।

নূরী ছলছল চোখে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়—তুমি একাই যাবে?

মাথায় পাগড়ী জড়াতে জড়াতে বলে বনহুর—হ্যাঁ।

কিন্তু পুলিশ ফোর্স রয়েছে আর রয়েছে গুলিভরা রাইফেল----

বনহুর কাপুরুষ নয়।

হুর!

এমন সময় পুনরায় রহমান কক্ষে প্রবেশ করে—সর্দার, তাজ প্রস্তুত।

নূরী রিভলবারখানা বনহুরের হাতে তুলে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে—খোদা হাফেজ।

পুলিশ ফোর্স রহমতকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে। লাশগুলোও তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়েছে। গাড়ি উল্কা-বেগে ছুটে চলেছে।

পেছনে ছুটে আসছে তাজের পিঠে দস্যু বনহুর।

একে অন্ধকার রাত, তার ওপর ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, সে সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বনহুরের অশ্বপদশব্দ পুলিশদের কানে পৌছে না। অতি নিকটে পৌছে যায় বনহুর!

বনহুর মোটরের আলো লক্ষ্য করে এগুচ্ছে! মাত্র কয়েক মিনিট। বনহুরের অশ্ব খুব কাছে এসে গেছে। হাওয়ার বেগটাও যেন আরও বেড়েছে। সাঁ সাঁ করে শব্দ হচ্ছে। সে শব্দ ভেদ করে বনহুরের অশ্ব এগিয়ে আসছে।

মোটরের পাশ কেটে চলে যায় তাজ, বনহুর লাফিয়ে পড়ে ড্রাইভ আসনে। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের গুলিতে ড্রাইভারের রক্তাক্ত দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে যায় গাড়ির মধ্যে। পুলিশরাও অন্ধকারে গুলি ছুঁড়তে থাকে, কিন্তু

নিজেদের গুলিতে নিজেরাই মরতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয় পেয়ে সমস্ত পুলিশ এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল।

বনহুর রহমতের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে তুলে নিলো তাজের পিঠে। তারপর ছুটে চললো হাওয়ার বেগে।

পরের দিন এই ঘটনা নিয়ে সারা দেশে হুলস্থূল পড়ে গেল। পুলিশমহলে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। মাত্র একজন দস্যু এতগুলো পুলিশকে পরাজিত করে বন্দীকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো, অথচ কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলো না।

মিঃ হারুন এবং আরও অন্যান্য পুলিশ অফিসার মিলে শংকর রাওয়ের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালাতে লাগলেন, কি করে এ দস্যুকে পাকড়াও করা যায়।

শংকর রাও ছদ্মবেশে বেরিয়ে ছিল, সঙ্গে গোপাল বাবুও চললেন। শংকর রাও গ্রাম্য বৃদ্ধের বেশে, গোপাল বাবুর শরীরে ছেঁড়া জামা-কাপড়, ঠিক একজন গ্রাম্য যুবক যেন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা।

সারাটা দিন ঘোরাফেরা করে ক্লান্ত হয়ে ছিল। সম্মুখে একটা হোটেল দেখে উঠে ছিল তাঁরা সে হোটেলে।

হোটেলে প্রবেশ করতেই একজন চিৎকার করে উঠলো—ভাগো হিয়াসে।

শংকর রাও বৃদ্ধের অনুকরণে গলার স্বরকে বদলে নিয়ে বলেন—দু'কাপ চা খাব বাবু সাব।

অন্য হোটেল দেখো গে, ভাগো এখান থেকে।

শংকর রাও মনে মনে ভীষণ রেগে গেল। গোপাল বাবুকে সঙ্গে করে হোটেল থেকে বেরুতে যাব, ঠিক সে মুহূর্তে কয়েকজন লোক প্রবেশ করলো হোটেলে।

শঙ্কর রাও থমকে দাঁড়ালেন, লোকগুলোর চেহারা যেন সন্দেহজনক বলে মনে হলো তাঁর কাছে।

শঙ্কর রাও গোপাল বাবুর গা টিপে দিল। তারপর পকেট হাতড়ে দশ টাকার একখানা নোট বের করে এগিয়ে দিল হোটেলের ম্যানেজারের দিকে—শুধু দু'কাপ চা।

ঐ চেয়ারে বসো। হোটেলের ম্যানেজার এক কোণের দুটি চেয়ার দেখিয়ে বলল।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু বসে ছিল এক পাশের দুটো চেয়ারে।

যে লোকগুলো কিছু পূর্বে হোটেলে প্রবেশ করেছিল, তারা ওদিকে কয়েকখানা চেয়ারে গোলাকার হয়ে বসে পড়ে।

বয় তাদের সম্মুখে কয়েকখানা মদের বোতল আর পেয়ালা রেখে যায়। মদ পান করতে করতে কি যেন সব আলাপ চলে তাদের মধ্যে। শঙ্কর রাও চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কান পাতেন। কে একজন বলছে—কাজ হাসিল করতে পারলে বহুৎ টাকা মিলবে। এরপর আরও কি কি যেন কথাবার্তা চললো, বুঝা গেল না।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু সেদিনের মত পথে নেমে ছিল। সে হোটেল সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁদের ঘনীভূত হলো।

পরদিন দু'জনে ভিখারীর বেশে এসে বসলেন, হোটেলের অদূরে বটতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে ভিক্ষে শুরু করলেন শঙ্কর রাও ও গোপাল বাবু কিন্তু দৃষ্টি তাঁদের রইলো সে হোটেলের দিকে।

সন্ধ্যে হয় প্রায়। চারদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে। লাইটপোস্টগুলো জ্বলে উঠবে একটু পরে, ঠিক সে সময় একটা কালো রঙের মোটর এসে থামলো হোটেলের সম্মুখে।

গাড়ি থেকে নেমে এলো এক কাবুলিওয়ালা। হোটেলে প্রবেশ করতেই হোটেলের ম্যানেজার লোকটাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। আরও কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে হোটেলের ভিতরে নিয়ে গেল।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু বটতলা থেকে সব দেখলেন। গোপাল বাবু চোখ টিপে বলেন—শঙ্কর, তুমি যাই বলো, ঐ বেটাই দস্যু বনহুরের লোক।

সত্যি?

আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।

❑

আজকাল মুরাদকে আর দাওয়াত করতে হয় না। প্রতিদিন একবার করে চৌধুরীবাড়িতে আসা চাই-ই। যদিও মনিরা তাকে বেশ এড়িয়ে চলে, তবু মুরাদ মনে কিছু করে না, বরং কিসে মনিরা তাকে ভালবাসবে তাই করে। মুরাদ এলে অত্যন্ত খুশি হন চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম।

মনিরাকে মিশার সুযোগ দিয়ে সরে থাকেন তাঁরা, কিন্তু মনিরা সে সুযোগ চায় না, মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয় সে।

মনিরাকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করে মুরাদ। চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম খুশিভরা কণ্ঠে সম্মতি জানান, কিন্তু মনিরাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারেন না তাঁরা।

একদিন মনিরা নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

মুরাদের গাড়ি এসে থামলো বারান্দায়। চৌধুরী সাহেব তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মুরাদ জিজ্ঞেস করলো—মনিরা কোথায়?

ব্যস্তকণ্ঠে বলেন চৌধুরী সাহেব—দেখি উপরে আছে বুঝি? তুমি বসো।

আজ বসবো না চৌধুরী সাহেব। কাল আমি বলে গেছি মনিরাকে একটা ফাংশনে নিয়ে যাব। দেখুনতো ওর কাপড়-চোপড় পরা হয়েছে কিনা?

আচ্ছা বাবা—আমি দেখছি। চৌধুরী সাহেব ব্যস্ততার সঙ্গে উপরে উঠে যান। সম্মুখে স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বলেন—মনি কই? মুরাদ এসেছে, ওকে নাকি কোন ফাংশনে নিয়ে যাবে, কালই বলে গেছে বেচারা, দেখতো তৈরি হয়েছে কিনা!

তাই নাকি, সে কথা তো তুমি আমাকে বলোনি, কি যে মেয়ে বাবা মরিয়ম বেগম মনিরার কক্ষের দিকে চলে যান, কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হন, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন—এ ভরসন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে আছিস কেন মনিরা?

কেন, শুতে দোষ আছে নাকি?

মুরাদ এসেছে!

তাতে আমার কি মামীমা?

সেকি, কাল নাকি সে তোকে বলে গেছে, আজ কোন ফাংশনে যাবে।

কোন ফাংশনে যাবার সখ আমার নেই।

মুরাদ যখন বলছে তখন যা না বাছা।

তা হয় না মামীমা, সে আমার কে যে তার সঙ্গে যাব?

পাগলী মেয়ে! দুদিন পর সে তোর স্বামী......

মামীমা...চিৎকার করে মরিয়ম বেগমকে থামিয়ে দেয় মনিরা।

মরিয়ম বেগম থ' মেরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মনিরার মুখের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান!

চৌধুরী সাহেব উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল, স্ত্রীকে বিষণ্ন মুখে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো? মনিরা....

ও কথা আমাকে আর বলো না।

সেকি! মুরাদ যে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে যেতে বলো, মনিরা যাবে না।

কি মুস্কিল! হঠাৎ আবার কি হলো তার?

মাথাটা নাকি বড্ড ধরেছে, কয়েকবার বমিও হয়েছে।

তাই নাকি, তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়!

ডাক্তার ডাকার আগে মুরাদকে বিদায় করে দাও।

আচ্ছা বলছি। নিচে নেমে যান চৌধুরী সাহেব।

মুরাদ ঘন ঘন পায়চারী করছিল, চৌধুরী সাহেবকে দেখে এগিয়ে আসে—মনিরা কই?

বড্ড দুঃখের কথা বাবা, মনিরার ভয়ানক জ্বর এসেছে। যেমন বমি তেমনি নাকি মাথাধরা...

হঠাৎ কেমন জ্বর তার?

খুব বেশি।

আমি তাকে একটু দেখতে পারি কি?

হ্যাঁ...না না, তুমি আবার কষ্ট করে....

এতে আর কষ্টের কি আছে, কই চলুন তো একবার দেখে আসি।

তোমার ফাংশনের বিলম্ব হয়ে যাবে।

তা হউক।

চৌধুরী সাহেব কিছু বলার পূর্বেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে চললো মুরাদ।

মরিয়ম বেগম আড়ালে থেকে সব শুনছিল। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন—কাল ভোরে এসে দেখে যেও বাবা, এখন একটু ঘুমাচ্ছে।

তা হউক, আমি ওকে জাগাবো না। উপরে উঠে মরিয়ম বেগমকে জিজ্ঞেস করলো মুরাদ—মনিরা কোথায়?

একটা ঢোক গিলে বলেন মরিয়ম বেগম—ঐ যে ঐ ঘরে।

কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে যায় মুরাদ মনিরার বিছানার দিকে—মনিরা, তোমার নাকি অসুখ? মাথায় হাত দিতে যায় মুরাদ। আজকাল মুরাদ মনিরাকে তুমি বলে সম্বোধন করে।

মনিরা চট করে সরে বসে বলে—খবরদার, গায়ে হাত দেব না।

তোমার নাকি অসুখ?

কে বলেন আমার অসুখ?

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমের মুখ অন্ধকার হয়ে যায়।

মুরাদের গলা শোনা যায়—তোমার মামুজান আর মামীমা বলেন।

মিছে কথা! আমার কোন অসুখ করেনি!

থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরী গুড। তাহলে তৈরি হয়ে নাওনি কেন?

আমি আপনার সঙ্গে কোথাও যাব না।

মনিরা!

আমি না গেলে আপনি কি করতে পারবেন?

তোমার মামুজান আর মামীমা এর জবাব দেব।

মামুজান আর মামীমার মতে আমার মত নয়—একথা ভুলে যাব না মিঃ মুরাদ।

মনিরা, এত সাহস তোমার?

হ্যাঁ, আমি...কিছু বলতে যাচ্ছিলো মনিরা। সে মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করেন চৌধুরী সাহেব—মনিরা কি হচ্ছে, এসব পাগলামি..

মুরাদ রাগতভাবে বলে ওঠে—চৌধুরী সাহেব, আমি বুঝতে পেরেছি আপনাদের চালাকি। এত মিথ্যাবাদী আপনারা!

মুরাদের অশালীন কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল চৌধুরী সাহেব, বলেন—মুরাদ, বিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম, বিয়ে তো আর দেইনি। এখানে তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি যেতে পারো।

বেশ, আমিও দেখে নেব, কথা দিয়ে কি করে কথা পাল্টান। বলেই খট খট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল মুরাদ।

তখনকার মত মুরাদ চলে গেলেও বাইরে থেকে বিষধর সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো, সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। গুণ্ডাদের আস্তানা হলো তার সম্বল। শয়তানদের সঙ্গে চললো তার গোপন আলোচনা। হাজার হাজার টাকা সে ছড়িয়ে দিতে লাগলো গুণ্ডাদের মধ্যে, যেমন করে হউক মনিরাকে তার চাই।

সেদিন মনিরা কোন এক ফাংশন থেকে ফিরছিল। নিজেদের গাড়ির বিলম্ব দেখে অন্য একটা ভাড়াটিয়া গাড়ি নিয়ে রওনা দিল সে।

গাড়ি ছুটে চলেছে, মনিরা জনমুখর রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। ভাবছিল মুরাদের কথা, জীবন থাকতে অমন অভদ্র লোককে সে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারবে না। এজন্য মামুজান আর মামীমা খুশি নন, তবু কি করবে মনিরা? নিজেকে তো আর বলি দিতে পারে না! ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল সে নয়! হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। গাড়িখানা থেমে পড়েছে।

মনিরা বাইরের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়, এ তো শহরের পথ নয়। কখন যে গাড়িখানা তাকে নিয়ে এক নির্জন গলির মধ্যে এসে পড়েছে, সে খেয়াল নেই মনিরার।

মনিরা জিজ্ঞেস করলো—ড্রাইভার, এ তুমি কোথায় আনলে?

ড্রাইভার কেমন ধরনের একটা বিদঘুটে হাসি হেসে বলেন—ঠিক জায়গায় এসে গেছি, এখন নেমে পড়ুন দেখি।

ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর এবং মুখের ভাব লক্ষ্য করে শিউরে উঠলো মনিরা। বিবর্ণ মুখে সে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বাইরে নজর পড়তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল তার কণ্ঠ। ভয়ঙ্কর চেহারার কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। কেমন যেন দুষ্টমির হাসি তাদের সকলের মুখে।

একজন লোক এগিয়ে এলো গাড়ির পাশে। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন সে—নেমে আসুন চট করে।

মনিরার দেহে তখন প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। কি করবে এখন সে ? এদের হাত থেকে পরিত্রাণের তো কোন উপায় নেই। তবু কণ্ঠে সাহস সঞ্চার করে নিয়ে বলেন—তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? কি তোমাদের উদ্দেশ্য?

তোমার বদলে টাকা চাই। নেমে এসো।

নামবো না, কিছুতেই আমি নামবো না। আমাকে তোমরা বাড়িতে পৌছে দাও, যত টাকা চাও দেব।

হা-হা করে হেসে উঠলো লোকটি—আমরা অত বোকা নই, টাকা আমরা তোমার মামুজানের নিকট হতে চাই না। তোমাকে পেলে টাকার অভাব হবে না।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষে বলে—শয়তান কোথাকার! শিগগির আমাকে বাড়ি পৌছে দাও, নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। মনিরা নিজকে বাঁচাবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু দুর্বল অসহায়া একটা রমণীর কথায় ভয় পাবার বান্দা ঐ লোকেরা নয়।

লোকটা পুলিশের নাম শুনে আরও জোরে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আমি পুলিশের বাবা, পুলিশ আমার কি করবে।

মনিরা চমকে উঠলো, বিস্ময়ভরা ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কে, দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ, তুমি দেখছি সহজেই আমাকে চিনে ফেলেছ।

দস্যু বনহুর! বদমাইশ কোথাকার। বহুদিন থেকে তুমি আমার পেছনে লেগেছ। আমি মরবো, তবু তোমার হাতে নিজকে সঁপে দেব না।

দেখি কেমন করে না দাও। বলিষ্ঠ লোকটা গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং জোরপূর্বক মনিরাকে টেনে নামিয়ে ফেললো।

মনিরা ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও.....

ঠিক সে মুহূর্তে আর একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এবং সংগে সংগে একটা যুবক ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে ছিল বলিষ্ঠ লোকটার ওপর। গুণ্ডার দল হঠাৎ এই বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না, যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। বলিষ্ঠ লোকটা আর যুবকে চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর বলিষ্ঠ লোকটা কাবু হয়ে এলো, সে পরাজিত হয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

গলিটার মধ্যে অন্ধকার তখন জমাট বেঁধে উঠেছে! মনিরা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল, আর যুবকটার মঙ্গল কামনা করছিল। ঠিক এই সময়ে যুবকটা যদি এসে না পড়তো তবে কি হত, ভাবতে পারে না সে।

ভয়ঙ্কর লোকটা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতেই মনিরা ছুটে গেল যুবকের পাশে। বিনীতকণ্ঠে বলেন—আপনার শরীরে আঘাত লাগেনি তো?

যুবক সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মনিরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। পাশের লাইটপোস্টের আলোতে সে দেখলো—প্যান্ট কোট টাই পরা একটা যুবক—অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা।

যুবক অন্য কেউ নয় দস্যু বনহুর। সে দূর থেকে মনিরার গাড়িখানাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু পথের মধ্যে হঠাৎ একটা এক্সিডেন্ট হয়, সে কারণে কিছু বিলম্ব হয় তার। তবু ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছে বলে মনে খুশি হয়েছে। বনহুর বিষ্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা সম্বিৎ ফিরে পায়। দৃষ্টি নত করে নিয়ে বলে— কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছিনে, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন!

হেসে বলে বনহুর— আপনাকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে পেরে নিজেও কম আনন্দিত হইনি।

ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে চারদিকে তাকালো মনিরা। তারপর চাপাকণ্ঠে বলেন— জানেন ওরা কে?

না তো, আমি কি করে জানবো?

দস্যু বনহুর আমাকে আক্রমণ করেছিল!

সত্যি!

হ্যাঁ, আপনি না এলে আমার উদ্ধার ছিল না, জানেন তো দস্যু বনহুর কত ভয়ঙ্কর!

হেসে বলে বনহুর— হ্যাঁ, দস্যু বনহুরের নাম শুনেছিলাম, আজ তার সঙ্গে লড়াই হলো।

আপনার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি কি করে যে অমন ভয়ঙ্কর দস্যুটাকে পরাজিত করলেন।

আর এখানে বিলম্ব করা ঠিক নয়, দস্যু বনহুর আবার হানা দিতে পারে। চলুন, আমার গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দি।

চলুন।

বনহুর নিজের গাড়ির দরজা খুলে ধরে— উঠুন।

মনিরার মাথাটা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে— কত ভদ্র, মহৎ এই যুবক! গাড়িতে উঠে বসে মনিরা।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

গাড়িতে বসে মনিরা এই যুবকটির কথা ভাবছে। তার জীবনে এই যুবকটি যেন খোদার একটি দান। বারবার যুবকের মুখখানা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

❑

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে হাত বাড়িয়ে পেছন সীটের দরজা খুলে ধরলো- চৌধুরীবাড়ি এই শহরের সবাই চেনে। নামুন, বাড়িতে যান।

আপনি নামবেন না?

আজ নয়, আর একদিন।

গাড়ি-বারান্দার উজ্জ্বল আলোতে মনিরা ভালো করে দেখলো বনহুরকে। মন যেন ওকে ছেড়ে দিতে চাইলো না, কিন্তু অপরিচিত এক যুবকের কাছে কি অধিকার আছে তার!

বনহুর গাড়িতে স্টার্ট দিল, মনিরা তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই মনিরা হলঘরে প্রবেশ করলো।

চৌধুরী সাহেব একটা পত্রিকা দেখছিল, মনিরার পদশব্দে কাগজখানা রেখে মুখ তুলেন—একি মা, এত রাত হলো যে?

মনিরা তাঁর পাশের সোফায় বসে পড়ে বলেন— মামুজান, জীবনে যে বেঁচে ফিরে এসেছি, এই ভাগ্য।

কেন মা, কোন এক্সিডেন্ট----

না মামুজান, দস্যু বনহুর আমাকে আক্রমণ করেছিল।

বলিস কি মনি দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, ভাগ্যিস এক ভদ্র যুবক আমাকে বাঁচিয়ে নিলেন, নইলে আর কোনদিন তোমরা আমাকে ফিরে পেতে না।

ওগো শুনছো? শুনো, শুনো--- চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

মরিয়ম বেগম এবং চৌধুরী সাহেব মনিরার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখে যেন তাঁদের কথা নেই।

কিছুক্ষণ লাগলো তাঁদের নিজেদের সামলাতে। কি ভয়ঙ্কর কথা! প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন চৌধুরী সাহেব মনি, যে তোমাকে রক্ষা করলো তাকে ঘরের দরজায় এসে ওভাবে ছেড়ে দেয়া তোমার উচিত হয়নি মা।

মরিয়ম বেগম স্বামীর কথায় যোগ দিল— শুধু রক্ষা নয়, মনিরার জীবন আমাদের মান-ইজ্জত সব বাঁচিয়েছে সে। মনিরা, তুমি শিক্ষিত মেয়ে, কি করে বিদায় দিলে? মনে একটু বাঁধলো না?

আমি তাকে নামতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু উনি বলেন— আজ নয়, অন্য দিন আসবেন।

পাগলী মেয়ে, তাই বুঝি তুই তাকে ছেড়ে দিলি? জিদ করলে নিশ্চয়ই সে না নেমে পারতো না।

ভুল হয়েছে মামীমা।

এবার চৌধুরী সাহেব বলেন— তার পরিচয়টা জেনে নেয়াও কি তোমার উচিত ছিল না? কি তার নাম, কোথায় থাকে---

মামুজান, আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম।

সত্যি, গো, দস্যু বনহুরের কবলে— এ যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার, ভাবলেও আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে। মনিরা, কোনদিন তুই একা বাইরে যাবিনে।

হ্যাঁ মামীমা, আর অমন কাজ করবো না।

❑

সেদিন মনিরা একটা বইয়ের দোকানে প্রবেশ করলো কতকগুলো বইয়ের অর্ডার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় তার পাশে দাঁড়ালো এক যুবক, মনিরা মুখ তুলে তাকাতেই তার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হেসে বলেন— আপনি?

বনহুর বলে ওঠে— আপনি দেখি আমাকে মনে রেখেছেন?

কি যে বলেন, কোনদিনই আপনাকে ভুলবো না। কি বাঁচাই না সেদিন আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন! আজ কিন্তু আর আপনাকে ছাড়ছিনে।

তার মানে?

মানে অতি স্বচ্ছ। মামুজানের হুকুম, আপনাকে তাঁর নিকটে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সেদিন আপনাকে বিদায় দিয়ে কি বকাটাই না খেলাম। যেমন বকলেন মামুজান, তেমনি মামীমা!

তাহলে তো এক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আর এক বিপদে পড়েছিল?

মিথ্যে নয়। হ্যাঁ একটা কথা, মনে কিছু নেবেন না?

বলুন?

আপনার পরিচয়টা?

ওঃ হ্যাঁ, পরিচয়টা এখনও আপনাকে দেয়া হয়নি। আমার নাম মনিরুজ্জামান চৌধুরী, ঠিকানা ৩৬/৩, বাগবান রোড চলুন না আজ আমার বাড়িতে, এই তো এখান থেকে একটু দূরে।

না না, তা হয় না। আপনিই আজ চলুন, পরে একদিন নিশ্চয়ই আপনার ওখানে যাব।

কিন্তু আমি তো আজ যেতে পারছিনে মিস মনিরা!

অবাক হয়ে তাকায় মনিরা বনহুরের মুখে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে— আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

হেসে বলে বনহুর— কারও নাম জানতে ইচ্ছে থাকলে অমনি জানা যায়। সেদিন আমি জেনে নিয়েছি।

বেশ লোক কিন্তু আপনি।

বনহুর আর মনিরা একসঙ্গে হাসতে থাকে।

বইগুলো প্যাক করে মনিরার সম্মুখে রাখে দোকানদার।

মনিরা ক্যাশমেমো দেখে টাকা মিটিয়ে দেয়, তারপর বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে— আজ কথা দিতে হবে, কবে তাহলে আসছেন?

আমার বাড়ির এত নিকটে এসে যখন চলে যাচ্ছেন তখন আমার যাওয়া-- তা যাব একদিন।

না, তা হবে না।

তাহলে---

আচ্ছা চলুন।

মনিরা বনহুরের গাড়িতে চেপে বসে।

ড্রাইভ আসনে ওঠে বনহুর। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে— অজানা অচেনা একজনের সঙ্গে যেতে মনে ভয় হচ্ছে বুঝি?

কি যে বলেন— আপনার সঙ্গে ভয়, আপনি তো ডাকাতের বাবা!

তাহলে ভরসা আছে আমার ওপর?

খুব।

আরও অনেক হাসিগল্প চলে।

বিরাট একটা বাড়ির সম্মুখে এসে বনহুরের গাড়ি থেমে ছিল।

মনিরা বাড়িখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হলো— এ যেন রাজ প্রাসাদ।

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো— নেমে পড়ুন।

মনিরা নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর মনিরাকে নিয়ে এগুতেই দারোয়ান সেলুট ঠুকে সরে দাঁড়ালো।

মনিরা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে এগুতে লাগলো। সেকি প্রকাণ্ড বাড়ি! গেটের পর গেট, ঘরের পর ঘর। প্রত্যেকটা ঘরে বেলওয়ারীর

ঝাড় ঝুলছে। মূল্যবান সরঞ্জামে ঘরগুলো সাজানো, কিন্তু মনিরা আশ্চর্য হলো, এত বড় বাড়িটায় শুধুমাত্র ঐ একটা যুবক।

অনেকগুলো ব্যালকনি পেরিয়ে একটা সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরাকে নিয়ে বনহুর। মনিরা তখনও অবাক হয়ে চারদিকে দেখছে। তার মামুজানও মস্ত বড়লোক, কিন্তু এত বড় বাড়ি তো তাদের নয়। রাজ-রাজার বাড়ি যেমন হয়, এ বাড়িটাও ঠিক তেমনি।

বনহুর হেসে বলেন—বসুন।

মনিরা বসে পড়ে বলে— এত বড় বাড়ি অথচ লোকজন তো দেখছিনে? আপনার বাবা-মা?

কেউ নেই।

আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে?

ওসব ঝঞ্ঝাটও নেই আমার।

এত বড় বাড়িটায় আপনি একা থাকেন?

চিরদিন যে একা, সে কোথায় পাবে সঙ্গী, বলুন। ওঃ আপনি বসুন, আমি একটু চা-নাস্তার ব্যবস্থা---

না না, ওসব কিছু লাগবে না, বরং আপনি বসুন।

তা হয় না মিস মনিরা, আপনি আমার অতিথি। বনহুর বেরিয়ে যায়।

মনিরা অবাক হয়ে ভাবে, অদ্ভুত এই যুবক। যার এত আছে, তার আবার সঙ্গীর ভাবনা? রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য সব আছে এর কিন্তু কেন সে একা নিঃসঙ্গভাবে জীবন কাটায়? ইচ্ছে করলেই যে কোন মেয়েকে সে গ্রহণ করতে পারে। যে নারী ওকে স্বামীরূপে পাবে সে ধন্য হবে, সার্থক হবে তার জীবন কিন্তু কেন সে এতদিনও বিয়ে করেনি?

মনিরা আনমনে উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। ওপাশে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াতেই আশ্চর্য হয়। কত রকমের ফুলগাছ শোভা পাচ্ছে বাগানে। ফুরফুরে হাওয়া আর অজানা ফুলের সুরভি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা।

কখন যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর, খেয়াল করতে পারেনি মনিরা। বনহুর হেসে বলে— কি দেখছেন অমন করে?

কি সুন্দর— অপূর্ব! আচ্ছা জামান সাহেব, আপনি ফুল বুঝি খুব ভালবাসেন?

হ্যাঁ চলুন, চা-ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কেন আপনি ওসব ঝামেলা করতে গেল! পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মনিরা আর বনহুর।

চা-নাস্তার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর আর মনিরার গল্প চলে। মনিরা এখন অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। বনহুরের দৃষ্টির মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। বনহুরের হাসির মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে নিজকে। কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে আসে, সেদিকে খেয়াল নেই মনিরার। বনহুর স্মরণ করিয়ে দেয়— মিস মনিরা, আপনার ফেরার সময় হয়েছে, বিলম্ব হলে আপনার মামুজান নিশ্চয় চিন্তিত হবেন।

উঠে দাঁড়ায় মনিরা— সত্যি আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বনহুর একটু হাসলো।

মনিরা আর বনহুর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। মনিরা বলেন— জামান সাহেব, আপনি আমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন তো?

আমি ড্রাইভার দিচ্ছি, সে আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

না, তা হবে না! আমি কোন ড্রাইভারকে বিশ্বাস করি না।

হো হো করে হেসে ওঠে বনহুর— খুব ভয় পেয়ে গেছেন দেখছি। কিন্তু আমাকেই বা আপনার এত বিশ্বাস কেন? আমি যদি আপনাকে নিয়ে পালাই?

পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস না করলেও আপনার ওপর আমার অবিশ্বাস হবে না। সত্যি জামান সাহেব, আপনি কত মহৎ!

বুঝেছি, আপনি আমাকে আজই আপনার মামুজানের নিকটে হাজির করতে চান।

তাহলে আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার মনোভাব, চলুন।

বনহুর আর বিলম্ব না করে ড্রাইভ আসনে উঠে বসে।

❑

চৌধুরীবাড়ি।

চৌধুরী সাহেব, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও ও গোপাল বাবু মিলে আলোচনা চলছিল। কয়েকদিন পূর্বে মনিরার সে আক্রমণ ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চলছিল। দস্যু বনহুর যে হঠাৎ ওভাবে মনিরার ওপর হামলা করে বসবে, এ যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। চৌধুরী সাহেব কন্যা-সমতুল্যা ভাগনীকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। দস্যু বনহুরের দৃষ্টি যে তার ওপর পড়েছে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কি করে এ দস্যুর

কবল থেকে মনিরাকে রক্ষা করা যাবে, এ নিয়ে আজ ক'দিন হলো পুলিশ অফিসে ঘোরাফেরা করছেন। আজ নিজে যেতে না পারায় ফোনে মিঃ হারুন সাহেবকে চৌধুরীবাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। যখন চৌধুরী সাহেব পুলিশ অফিসে ফোন করেন, তখন মিঃ হারুনের পাশে রাও এবং গোপাল বাবু উপস্থিত ছিল।

শঙ্কর রাও মিঃ হারুনের নিকট ঘটনাটা শুনে থাকতে পারলেন না, তিনিও গোপাল বাবুকে নিয়ে মিঃ হারুনের সঙ্গে চৌধুরীবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

সবাই মিলে আলোচনা চলছে, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা আর বনহুর। মনিরা আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠে— মামুজান, ইনিই সেদিন আমাকে দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা করেছিল।

সকলেই একসঙ্গে বনহুরের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

চৌধুরী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বনহুরকে জড়িয়ে ধরেন বুকে। তারপর আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন— আপনাকে কি বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছিনে। আপনি আমার মান-ইজ্জত রক্ষা করেছেন, আপনার কাছে আমি চিরঋণী।

পিতা-পুত্রের অপূর্ব মিলন। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কেউ না জানলেও সে জানে— চৌধুরী সাহেবই তার পিতা। মনে মনে পিতাকে হাজার সালাম জানায় বনহুর।

চৌধুরী সাহেবও হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করেন, বনহুরকে কিছুতেই বুক থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না তাঁর।

মামুজান আর জামান সাহেবের মিলনে মনিরার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, খুশির আবেগে বেরিয়ে যায় সে।

এবার চৌধুরী সাহেব বনহুরকে পাশের সোফায় বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়েন।

বনহুরের অপূর্ব সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে ফেলে। মনিরা বয়ের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। চৌধুরী সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন বনহুরকে, কিন্তু মনিরাই সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

বনহুর সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে আসন গ্রহণ করলো।

মনিরা হেসে বলেন— মামুজান, উনি কিন্তু মস্ত বড়লোক।

বনহুর লজ্জিতকণ্ঠে বলেন— মিছেমিছে বাড়িয়ে বলছেন মিস মনিরা।

না মামুজান, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি।

হাসিগল্পের মধ্য দিয়ে চা-নাস্তা চলে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন শঙ্কর রাও— মিঃ মনিরুজ্জামান, আমি আপনাকে একটু বিরক্ত করবো। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

স্বচ্ছন্দে করুন।

শঙ্কর রাও একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন— আচ্ছা মিঃ জামান, আপনি মিস মনিরাকে উদ্ধারের জন্য যখন নিজের গাড়ি থেকে দস্যুদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন তাদের দলে কত জন ছিল বলে আপনার মনে হয়?

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু চিন্তা করলো, তারপর বলেন—পাঁচ ছ'জন হবে।

ওরা কি সকলেই আপনাকে আক্রমণ করেছিল?

না, আমাকে দেখামাত্র সবাই সরে পড়ে। শুধু একজন, দলের সর্দার হবে হয়তো, সে আমাকে আক্রমণ করেছিল।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— মিঃ জামান, আপনার কি মনে হয়, সে লোকটাই দস্যু বনহুর?

বনহুর একটা চিন্তার ভান করে বলে— আমি তো আর দস্যু বনহুরকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিনি, তবে অনুমানে এবং তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মনে হলো বনহুর ছাড়া আর কেউ সে নয়। ইস, কি শক্তিই না তার শরীরে!

চৌধুরী সাহেব হেসে বলেন— আপনার কাছে হার মানাতে সে বাধ্য হলো। পরাজিত হলো আপনার নিকট।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ জামান, দস্যু বনহুরকে পরাজিত করে মিস মনিরাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। কথাটা বলে বনহুরের পিঠ চাপড়ে দেন মিঃ হারুন। একটু থেমে পুনরায় বলেন— আশা করি দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, প্রয়োজন মত আমাকে পাবেন।

মিঃ শঙ্কর রাও বলেন— হ্যাঁ মিঃ জামান, আপনি যদি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে আমাদের সাহায্য করেন, তবে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

মনিরা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর সকলের অলক্ষ্যে একবার তাকালো মনিরার মুখে। দৃষ্টি বিনিময় হলো। দু'জনের অন্তর যেন দু'জনকে দেখতে পেল। অভূতপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করলো মনে তারা।

বনহুর মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালো— আজ তাহলে চলি।

চৌধুরী সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যেন হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করলেন। শান্ত মিষ্টি গলায় বলেন— আবার কবে আসবেন কথা দিন?

ঠিক বলতে না পারলেও, আসবো। আর একবার তাকালো বনহুর মনিরার দিকে। মনিরা দৃষ্টির মাধ্যমে ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

এরপর হতে প্রায়ই আসে বনহুর।

চৌধুরী সাহেব, মরিয়ম বেগম সবাই বনহুরকে ভালবেসে ফেলেছেন। বনহুর এলে তাঁরা যেন মনে শান্তি অনুভব করেন, মনিরার তো আনন্দ ধরে না। যেদিন বনহুর আসার কথা থাকে, সেদিন মনিরা নিজেকে মনের মত করে সাজায়, সকাল থেকে গুন গুন করে গান গায়।

চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম বুঝতে পারেন ভাগ্নীর মনোভাব। তাঁরা উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে হাসেন, অজ্ঞাত এক বাসনা উঁকি দিয়ে যায় তাঁদের মনের কোণে।

মুরাদ সেদিন রাগ করে চলে যাবার পর থেকে চৌধুরী সাহেব ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল, বনহুরের আবির্ভাব আবার তাঁর হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ এনে দেয়। চৌধুরী সাহেব ধীরে ধীরে ভুলে যান মুরাদকে।

একদিন বিকেলে বনহুরের সঙ্গে মনিরা বেড়াতে বেরুলো। সে লেকের ধারে গিয়ে গাড়ি থেকে নামলো তারা। পাশাপাশি এগিয়ে চললো মনিরা আর বনহুর। কি নিয়ে যেন দু'জন বেশ হাসছিল।

মুরাদ দূর থেকে মনিরা আর বনহুরকে লক্ষ্য করলো। হিংসায় জ্বলে উঠলো তার অন্তরটা, কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

বনহুর বলেন— মিস মনিরা, চেয়ে দেখুন ঐ অস্তগামী সূর্যের দিকে।

হেসে বলেন মনিরা—অপূর্ব!

ঠিক আপনার রক্তিম গণ্ডের মত— তাই না?

যান!

মিস মনিরা, সত্যি আপনার মত মেয়েকে আমার বড্ড ভালো লাগে—চোখে লজ্জা, মনে নম্রতা, মিষ্টিমধুর কণ্ঠস্বর—অপরূপ!

মনিরার মন তখন চলে গেছে পেছনের একটি দিনে। মুরাদ আর সে পাশাপাশি বসে আছে এমনি এক সন্ধ্যায়। মুরাদ বলছে, মনিরা তুমি বড্ড লাজুক, একদম সেকেলে ধরনের— কি বিশ্রী, কি কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠস্বর মুরাদের।

কি ভাবছেন মিস মনিরা?

মিস নয়, শুধু মনিরা বলুন।

তুমি যদি খুশি হও তাহলে তাই হবে। এবার বলো কি ভাবছো?

বনহুর মনিরাকে তুমি বলে সম্বোধন করে। মনিরাও বনহুরকে তুমি বলে সম্বোধন করে। কারণ ওরা দু'জন দু'জনের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

নাই বা শুনলে সে কথা!

যদি না বলার মত হয়, তাহলে আমি শুনতে চাইনে মনিরা।

ঠিক সে মুহূর্তে মুরাদ মনিরার পেছনে এসে দাঁড়ালো, কঠিন কণ্ঠে বলেন— মিস মনিরা, কে এই যুবক?

মনিরা উঠে দাঁড়ালো, সেও কঠিন কণ্ঠে বলেন— আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করার কে?

তোমার আব্বা একদিন আমার সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দেবেন কথা দিয়েছিল— একথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেই অধিকারে--

খবরদার, আর কথা বলবেন না, চলে যান এখান থেকে।

ওঃ আজ দেখছি বড্ড সাহস বেড়েছে? চলো, তোমার আব্বার কাছে নিয়ে এর জবাব দেব--- মনিরার হাত ধরতে যায় মুরাদ।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেয় মুরাদের নাকে। মুরাদ পড়ে যায়, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছে, তারপর বনহুর আর মনিরার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে চলে যায়।

হেসে ওঠে মনিরা, বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন।

বনহুর বসতে যায়। মনিরা বলে— ওখানে বসে আর কাজ নেই, চলো এবার ফেরা যাক।

কেন, ভয় হচ্ছে?

না, তুমি পাশে থাকলে আমার কোন ভয় নেই। তবু চলো এখানে বসতে মন আর চাইছে না।

চলো তাহলে।

❑

সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মনিরা সাজগোজ করে ড্রইং রুমে বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে আর বারবার তাকাচ্ছে দেয়াল ঘড়িটার দিকে।

আজ রাত সাড়ে আটটায় এক বান্ধবীর বাড়িতে তার দাওয়াত আছে। মনিরা বনহুরকে বলে দিয়েছে— অবশ্য অবশ্য সে যেন গাড়ি নিয়ে আসে, তার গাড়িতেই যাবে মনিরা। নইলে সন্ধ্যার পর বাইরে বেরুবার সাহস নেই তার। চৌধুরী সাহেবও বারণ করে দিয়েছেন।

মনিরা উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী শুরু করে, হাতঘড়ির দিকে তাকায়— আটটা বেজে গেছে।

এমন সময় গাড়ি-বারান্দায় মোটর থামার শব্দ হয়। পরক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে— বড্ড দেরী হয়ে গেছে, না?

মনিরা টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলে— চলো।

অমনি মরিয়ম বেগম দু'জনের পাশে এসে দাঁড়ান। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলেন— দেখ বাবা, তোমার ওপর ভরসা করেই ওকে বাইরে পাঠাচ্ছি। দস্যু বনহুরের ভয়ে আমার তো কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে, আবার না সে মনির ওপর হামলা করে বসে।

মরিয়ম বেগমের ব্যথাকাতর কণ্ঠস্বর বনহুরের হৃদয়ে আঘাত করলো। তার মা, তার গর্ভধারিণী জননী আজ তারই ভয়ে ভীত। আজ তাঁর নিকটে পুত্র পরিচয় দেবার কোন অধিকার নেই। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তার অবাধ্য কণ্ঠ দিয়ে হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো— মা।

মরিয়ম বেগম বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন বনহুরের মুখে। এই মা ডাক তাঁর প্রাণে এক অপূর্ব শিহরণ জাগালো। মাতৃহৃদয় আকুলি বাকুলি করে উঠলো। তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। জবাব দিল— বল বাবা?

বনহুর ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। হেসে বলেন— দস্যু বনহুর আপনার কোন অন্যায় করবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

যাও বাবা, ওদিকে মনিরার সময় হয়ে এলো।

চলো মনিরা।

বনহুর আর মনিরা পাশাপাশি ড্রাইভ আসনে ওঠে বসলো। জনমুখর রাজপথ ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে।

মনিরার শাড়ির আঁচলখানা বারবার বনহুরের গায়ে উড়ে উড়ে পড়ছিল। একটা সুমিষ্ট গন্ধ, বনহুরের প্রাণে দোলা লাগে।

বনহুর মৃদু হেসে বলে— মনিরা!

বলো?

এই নির্জন গাড়ির মধ্যে যদি মিঃ জামান না হয়ে দস্যু বনহুর থাকতো তোমার পাশে?

মনিরা দক্ষিণ হাতে বনহুরের মুখ চেপে ধরে— ও নাম তুমি মুখে এনো না, ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

মনিরা!

বলো?

দস্যু বনহুর কি মানুষ নয়?

মনিরা বনহুরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে— ওসব আলোচনা না-ই বা করলে।

মনিরা, ধর বনহুর তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে, তার প্রতিদানে তাকে তুমি ভালবাসতে পারো না?

ছিঃ এসব কি বলছো? যে মানুষ নামের কলঙ্ক, তাকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছো—

মনিরা! অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে বনহুর।

মনিরা চমকে উঠে বলে— কি হলো?

কিছু না। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলে— এসে গেছি।

❑

বনহুর আর মনিরা কক্ষ থেকে চলে যাবার পর মরিয়ম বেগম সোফায় বসতে যাবেন, হঠাৎ সোফার পাশে একখানা নীল রঙের কাগজ পড়ে আছে দেখতে পান।

কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়েই চমকে ওঠেন। তাতে লেখা রয়েছে-

'আজ রাতে আমি আসবো'

—দস্যু বনহুর

মরিয়ম বেগমের কম্পিত হাত থেকে কাগজখানা পড়ে যায়। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যান তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে চৌধুরী সাহেব এসে পড়েন। স্ত্রীকে বিবর্ণ মুখে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন— অমন গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন?

মরিয়ম বেগম আংগুল দিয়ে কাগজখানা দেখিয়ে দেন।

চৌধুরী সাহেব কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে দৃষ্টি বুলাতেই থ' হয়ে গেছেন, ঢোক গিলে বলেন— তাহলে উপায়?

মরিয়ম বেগম বলেন— এক্ষুণি পুলিশে খবর দাও।

ঠিক বলেছ। চৌধুরীসাহেব কালবিলম্ব না করে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। এইমাত্র দস্যু বনহুরের চিঠি পেয়েছি আমরা তো ভীষণ ভয় পাচ্ছি, মনিরাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা। মিঃ হারুন, আপনিই এখন আমাদের ভরসা।

মনিরাকে নিয়ে বনহুর যখন ফিরে এলো, তখন চৌধুরীবাড়ি পুলিশে ভরে গেছে। মিঃ হারুন উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করছেন আর বলছেন— চৌধুরী সাহেব, এই ঘটনার পরও মনিরাকে সন্ধ্যার পর বাইরে পাঠানো আপনার উচিত হয়নি।

চৌধুরী সাহেব স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেন— ইন্সপেক্টার সাহেব, মনিরার সঙ্গে জামান আছে, সে সঙ্গে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমাদের আশঙ্কা করার কিছু নেই।

এসব আলোচনা চলছে, ঠিক সে সময় বনহুর আর মনিরা হাস্যোজ্জল মুখে কক্ষে প্রবেশ করলো।

চৌধুরী সাহেব কলকণ্ঠে বলে ওঠেন— ঐ যে মনি এসে গেছে? দেখুন ইন্সপেক্টার সাহেব, আমি বললাম না আমাদের জামান থাকতে ওর কোন চিন্তা নেই।

একথা মিথ্যে নয় চৌধুরী সাহেব। জামান সাহেব সত্যই একজন বীর পুরুষ। কথাটা বলেন মিঃ হারুন।

মনিরা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে— মামুজান, হঠাৎ ইনারা? আমি কিছু বুঝতে পারছিনে?

চৌধুরী সাহেব ভয়ার্তকণ্ঠে বলেন— ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

বনহুর আশ্চর্য হবার ভান করে বলে— ভয়ঙ্কর ঘটনা! বলছেন কি? হঠাৎ কি ঘটলো?

এই দেখ! চৌধুরী সাহেব নীল রঙের কাগজখানা পকেট থেকে বের করে বনহুরের হাতে দেন।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। কাগজখানা চৌধুরী সাহেবের হাতে দিয়ে বলে— ভয় পাবার কিছু নেই।

— তার মানে? বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠেন মিঃ হারুন। দস্যু বনহুরের চিঠি, অথচ আপনি বলছেন ভয় পাবার কিছু নেই!

ওটা বনহুরের একটা খেয়াল, বিশেষ করে পুলিশ মহলকে সে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।

আপনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না, তাই ও কথা বলতে পারলেন। দস্যু বনহুর যে কত ভয়ঙ্কর তা শুধুমাত্র একদিনের লড়াইয়ে অনুভব করতে পারেননি সেদিন কোন বেকায়দায় পড়ে আপনার হাতে----

সে কাবু হয়েছে, কি বলেন? কথাটা বলে হাসে বনহুর।

চৌধুরী সাহেব বলে ওঠেন—সে যাই হইক বাবা, আজ আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না, থাকতেই হবে আমাদের এখানে।

তা কি করে হয় বলুন, বাসায় একটা জরুরী কাজ আছে।

তা রাতের বেলা এমন আর কি কাজ। থেকেই যান মিঃ জামান। কথাটা বিনয়ের সঙ্গে বলেন মিঃ হারুন।

মনিরার মুখের দিকে তাকায় বনহুর। মনিরার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, করুণ দৃষ্টির মাধ্যমে বনহুরকে সে থাকার অনুরোধ জানায়।

অগ্যতা বনহুর থাকবে বলে কথা দেয়।

চৌধুরী সাহেব কতকটা আশ্বস্ত হন। মিঃ হারুনের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে, যাক তবু একজন শক্তিশালী সাহসী ব্যক্তি আজ তাদের সঙ্গী হলো— যদি দস্যু বনহুর এসেই পড়ে, কৌশলে তাকে বন্দী করার সুযোগ হলেও হয়ে যেতে পারে।

❑

গভীর রাত।

সে হোটেল, হোটেলের সম্মুখে একটি গাড়ি এসে থেমে ছিল।

অমনি একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুটি ছায়ামূর্তি।

গাড়ি থেকে নামলো সে কাবুলীওয়ালা। অন্ধকারে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, তারপর দ্রুত হোটেলে প্রবেশ করলো।

ছায়ামূর্তি দুটি অতি গোপনে কাবুলীওয়ালাকে অনুসরণ করলো, হোটেলের বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলো পুলিশ ফোর্স। ছায়ামূর্তি দুটি

অন্য কেউ নয়, একজন মিঃ শঙ্কর রাও, অন্যজন গোপালবাবু। তাঁরা অতি সাবধানে এগিয়ে চলেন।

কিছুদূর এগুতেই শুনতে পেলেন তাঁরা একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মিঃ শঙ্কর রাও কান পেতে চেষ্টা করলেন, কোন এক গোপন কক্ষ থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে--- একটা লোকের সঙ্গে তোমরা এতগুলো লোক পারলে না, তোমরা কাপুরুষ। যত টাকা লাগে লাগবে, মেয়েটাকে আমার চাই। নইলে মনে রেখ, তোমাদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে হত্যা করবো।

একটা ভারী কর্কশ কণ্ঠস্বর— হুজুর, সবাই পালিয়ে গেলেও আমি পালাইনি, শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছি----

পুনরায় পূর্বের কণ্ঠ— আমি কোন কৈফিয়ত শুনতে চাইনে। এবার যদি তোমরা বিফল হও, আমি কাউকে ক্ষমা করবো না।

নির্জন নিস্তব্ধ হোটেলের ভিতরে জেগে উঠলো ভারী বুটের শব্দ। কেউ যেন এগিয়ে আসছে।

জমকালো রিভলবারটা দক্ষিণ হাতে চেপে ধরে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ শঙ্কর রাও।

গোপাল বাবু তাঁর কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলেন— দস্যু বনহুর এদিকেই আসছে।

হ্যাঁ, তুমি রিভলবার ঠিক রেখে সাবধানে দাঁড়াও।

অন্ধকারে লক্ষ্য করলেন শঙ্কর রাও, হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে সে কাবুলীওয়ালা। অমনি এক লাফে মিঃ শঙ্কর রাও কাবুলীওয়ালার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রিভলবার বাকিয়ে ধরলেন, খবরদার, নড়বে না, নড়লেই মৃত্যু।

হঠাৎ এ বিপদের জন্য ঘাবড়ে গেল কাবুলীওয়ালা।

গোপালবাবু ততক্ষণে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছেন।

মুহূর্তে হোটেলকক্ষ পুলিশ ফোর্সে ভরে উঠলো।

ধীরে ধীরে হাত তুলে দাঁড়ালো কাবুলীওয়ালা।

একজন পুলিশ অফিসার তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মিঃ শঙ্কর রাও অন্যান্য পুলিশকে ইঙ্গিত করলেন হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করে দস্যুর অনুচরগণকে বন্দী করতে কিন্তু হোটেলে কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না, সবাই যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

মিঃ শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু পুলিশ ফোর্স নিয়ে বীরদর্পে ফিরে চলেন। তাঁদের মনে আনন্দ ধরে না। দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে পেরেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা।

কাবুলীওয়ালাকে হাজতে বন্দী করে কড়া পাহারায় রেখে মিঃ শঙ্কর রাও যখন বাসায় ফিরলেন, তখন আশ্চর্য হয়ে গেল, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

মিঃ শঙ্কর রাওকে দেখামাত্র মিঃ হারুন বলে ওঠেন— আপনি এসে গেছেন ভালই হলো। এক্ষুণি আপনাকে চৌধুরী বাড়ি যেতে হবে।

কেন?

দস্যু বনহুর চিঠি দিয়েছে, সে নাকি আজ রাতে হানা দেবে।

বলেন কি, দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ।

কিন্তু তাকে আমি এইমাত্র হাজতে বন্দী করে রেখে এলাম।

সে কি রকম।

আপনাকে পুলিশ অফিসে না পেয়ে মিঃ আহমদের নিকট পারমিশন নিয়ে পুলিশফোর্স সঙ্গে করে সে হোটেলে হানা দিয়েছিলাম। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। গর্বিতভাবে বলেন মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন বিস্ময়ভরাকণ্ঠে বলেন— দস্যু বনহুরকে এত সহজেই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন, বড় আশ্চর্যের কথা! চলুন, প্রথমে তাকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসি। উঠে পড়েন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

চলুন।

দেখুন আপনি এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরলেন, পুনরায় কষ্ট করে--- না না, এতে আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না।

গাড়িতে উঠে বসেন মিঃ হারুন এবং শঙ্কর রাও।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন সাবইন্সপেক্টার মিঃ কায়সার—স্যার, চৌধুরী বাড়ি থেকে আপনার নিকট ফোন এসেছে। এইমাত্র নাকি দস্যু বনহুরের আর একখানা চিঠি পাওয়া গেছে।

একসঙ্গে বলে উঠেন মিঃ হারুন এবং শঙ্কর রাও— দস্যু বনহুরের চিঠি!

ইয়েস স্যার!

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন— চলুন দেখবেন, আমি দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি কিনা।

চলুন।

আরও কয়েকজন অফিসারসহ মিঃ হারুন এবং মিঃ শঙ্কর রাও হাজত কক্ষে প্রবেশ করলেন। মিঃ হারুন ও মিঃ শঙ্কর রাও এগিয়ে যান কাবুলীওয়ালাবেশী বন্দীর দিকে।

মিঃ হারুন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকালেন বন্দীর মুখে, তারপর হেসে বলেন— দস্যু বনহুর এ নয়, মিঃ রাও।

তার মানে?

মানে এই দেখুন। একটানে কাবুলীওয়ালার দাড়ি খুলে ফেলেন মিঃ হারুন

সকলে বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। মিঃ শঙ্কর রাও অবাক হয়ে বলেন- একি, এ যে খানবাহাদূর সাহেবের ছেলে মিঃ মুরাদ!

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— শিগ্‌গির চলুন, বনহুর হয়তো এতক্ষণে চৌধুরীবাড়িতে হানা দিয়েছে।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু ছুটলেন চৌধুরীবাড়ির উদ্দেশ্যে। যদিও সেখানে পুলিশ পাহারা রাখা হয়েছে, তবুও তাঁরা নিশ্চিন্ত নন।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল তারা চৌধুরীবাড়িতে। কিন্তু পৌঁছতেই চৌধুরী সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন— ইন্সপেক্টার সাহেব, এত কড়া পাহারার মধ্যেও দস্যু বনহুর এসেছিল।

বলেন কি!

হ্যাঁ, আপনি এদিকে পাহারার ব্যবস্থা করে চলে যাবার পর আমি বড্ড ক্লান্তি অনুভব করলাম। তাই একটু বিশ্রামের জন্য নিজের কক্ষে গেলাম, দরজা বন্ধ করে যেমনি বিছানায় শুতে যাব, অমনি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এক ছায়ামূর্তি! কি ভয়ংকর তার চেহারা, রিভলবার উদ্যত করে বলেন সে— ভয় নেই, আমি আপনাকে হত্যা করবো না, কিন্তু আমার একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে— একটু থামলেন চৌধুরী সাহেব।

কক্ষের সকলে স্তব্ধ নিশ্বাসে শুনছেন তাঁর কথাগুলো। মিঃ হারুন একবার কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন।

চৌধুরী সাহেবের অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে আছে মনিরা, তার ওপাশেই আর একটা সোফায় বসে আছে বনহুর। মিঃ হারুন কক্ষে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতেই বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

চৌধুরী সাহেব বলে চলেন— আমি বললাম, তুমিই দস্যু বনহুর? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, আমার কথা না রাখলে মৃত্যু আপনার অনিবার্য। আমি ভয়ে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, বলো তুমি কি বলতে চাও? সে বলেন— সাবধান, মনিরার বিনা অনুমতিতে কখনও তাকে বিয়ে দিতে যাবেন না যেন। কথা শেষ করেই সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে ফেললো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম। সবাই যখন ছুটে এলো, আলো জ্বেলে দেখি কোথায় বনহুর, কেউ নেই!

মিঃ হারুন গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—হুঁ।

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন— আপনার ভাগ্নির বিয়েতে মতামত সম্বন্ধে দস্যু বনহুরের কি স্বার্থ থাকতে পারে?

চৌধুরী সাহেব বলেন— নিশ্চয়ই বনহুরের দৃষ্টি আমার মনিরার উপর পড়েছে।

সে কথা মিথ্যে নয়, চৌধুরী সাহেব। এ না হলে সে এখানে আসতে যাবে কেন? সত্যি আমি বড় দুঃখিত, নিজে থেকেও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলাম না। কথাগুলো বলেন দস্যু বনহুর।

না, না, এতে দুঃখ করার কিছু নেই বাবা! তুমিই বা এ অবস্থায় কি করবে। চৌধুরী সাহেব বনহুরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

মিঃ হারুন হঠাৎ গম্ভীরকণ্ঠে বলে ওঠেন— চৌধুরী সাহেব, বনহুরকে আজ আমি গ্রেপ্তার করবোই।

সকলেই বিস্ময়ভরা নয়নে তাকালেন মিঃ হারুনের মুখে।

মিঃ হারুন তেমনিভাবেই বলেন— সে এ কক্ষেই বিদ্যমান। একসংগে বলে ওঠেন— বলেন কি!

মনিরা ভয়ার্ত চোখে তাকালো কক্ষের চারিদিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। সবচেয়ে নিরাপদ স্থান যেন ওর ওটা।

মিঃ হারুন ঠিক সে মুহূর্তে রিভলবার বের করে উদ্যত করে ধরলেন বনহুরের দিকে এবং পুলিশদেরকে বলেন— ঐ ভদ্র যুবককে গ্রেপ্তার কর।

মনিরা স্তব্ধ নিঃশ্বাসে তাকালো বনহুরের মুখে। বনহুরও একবার তাকিয়ে নিল মনিরার মুখের দিকে। তারপর চোখের পলক মাত্র; আচমকা এক ঝটকায় মিঃ হারুনের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে ছিল মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে।

পুলিশ ফোর্স একসঙ্গে গুলি ছুঁড়লো— গুড়ুম গুড়ুম। কতকগুলো পুলিশ ছুটলো অন্ধকারে।

মনিরার মনে তখন ঝড়ের তাণ্ডব বইতে শুরু করেছে। কম্পিত প্রাণে সে আল্লাহকে স্মরণ করলো— হে আল্লাহ, ওকে তুমি বাঁচিয়ে নাও। ওকে বাঁচিয়ে নাও!

চৌধুরী সাহেব থ' মেরে গেছেন। তাঁর শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো— এ কি করে সম্ভব হয়? মনে মনে একটা গভীর ব্যথা অনুভব করেন। চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

মিঃ হারুন হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতভম্ব হয়ে ছিল। এর জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এত দ্রুত তাঁর হাত থেকে বনহুর রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল যে, কিসে কি হলো মিঃ হারুন বুঝতেই পারলেন না। চেহারা তাঁর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। দস্যু বনহুরকে এত নিকটে পেয়েও হারালেন!

মিঃ শংকর রাও হেসে বলেন— ইন্সপেক্টার সাহেব, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নয়।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— কিন্তু আমি দেখে নেবো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারি কিনা! কথাটা বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান মিঃ হারুন। অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং পুলিশগণ তাঁকে অনুসরণ করে।

❑

গোটারাত মনিরার অনিদ্রায় কাটলো। পরদিন ভোরে চায়ের টেবিলে বসে কন্যা সমতুল্যা ভাগনীর চেহারা লক্ষ্য করে চৌধুরী সাহেব বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। তিনি জানেন, মনিরা জামানকে কত ভালবাসতো। চৌধুরী সাহেব নিজেও কম ভালবাসেন কি! অমন চেহারা, অমন ব্যবহার, কে না তাকে ভালবেসে পারে! কিন্তু সে যে সে ডাকাত শুধু। ডাকাত নয়, দুর্দান্ত দস্যু বনহুর যার ভয়ে আজ গোটা দেশবাসী কম্পমান। না না, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না চৌধুরী সাহেব। যতই সে ভাল হউক, যতই সে মহৎ হউক তবু সে দস্যু। শাস্তি তার পাওয়া উচিত।

চৌধুরী সাহেব মনিরার মনকে প্রফুল্ল করার জন্য হেসে বলেন— মনি, চল মা সকাল বেলাটা কোথাও থেকে ঘুরে আসি। আজ ক'দিন থেকে তোমার মামীমাও বেড়াতে যাব বলছেন।

মনিরা চায়ের খালি কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন— মামুজান, আজ আমার যে এক বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা আছে। হাতঘড়ির দিকে তাকায় মনিরা, তারপর উঠে দাঁড়ায়।

চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন, মনিরা নিশ্চয়ই সে দস্যু বনহুরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। একদিন কথায় কথায় তিনি মনিরার নিকটে শুনেছিল শহরের শেষ প্রান্তে জামানের বাড়ি। রাস্তার নাম এবং নম্বরটাও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। মনে মনে হাসলেন চৌধুরী সাহেব। এমন একজন দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে পারলে শুধু তাঁর সুনাম হবে না, এতে কৃতিত্ব আছে অনেক।

মনিরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতেই চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন— জানো মরিয়ম, মনি এখন কোথায় গেল?

মরিয়ম বেগম বলেন— মনি তো বলেই গেল তার কোন বান্ধবীর বাড়ি যাবে সে।

না গো না, মনি গেল সে দস্যুটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

তুমি জানলে, অথচ বাধা দিলে না?

না, আমি বাধা দেব না; বরং তার সাক্ষাতে আমি দস্যু বনহুরকে পুলিশের হাতে তুলে দেব!

এসব তুমি কি বলছো?

হ্যাঁ মরিয়ম, মনিরা ছদ্মবেশী ভদ্রযুবক দস্যু বনহুরকে ভালবেসে ফেলেছে। শুধু ভালবেসেছে নয়, তাকে সে গোটা অন্তর দিয়ে কামনা করে আসছে।

দেখ শুধু কি মনিরাই তাকে ভালবেসেছিল। কি জানি, আমার গোটা মনটাও যেন সে অধিকার করে বসেছিল। সত্যি সে যে দস্যু, একথা আমি এখনও ভাবতে পারিনে। আমার মনটা কেমন যেন ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে উঠছে। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ।

চৌধুরী সাহেবের হৃদয়ে ব্যথার আঁচ লাগে। তিনি গম্ভীর গলায় বলেন— কি যাদু জানে সে, কে জানে। কেন যে ওকে এত ভালো লাগতো আমি নিজেও বুঝি না। যাক শুনো মরিয়ম, আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যাব।

কেন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন মরিয়ম বেগম।

দস্যুকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনে, যতই মহৎ, যতই উদার হউক সে, যতই গুণ তার থাক, তবু সে দস্যু। আমার কর্তব্য তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া।

কি হবে তাকে পুলিশে দিয়ে! তা'ছাড়া তোমার তো এতে কোন স্বার্থ নেই? আমি জানি সে যত বড় দস্যু হউক, আমাদের কোন ক্ষতিই সে করবে না কোনদিন।

আমাদের ক্ষতি সে নাও করতে পারে। তবু চোর-ডাকাত এদের কোন বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে দেশবাসীকে ঐ দস্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতেই হবে। উঠে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব।

মরিয়ম বেগম বলেন— কোথায় চললে?

ঐ তো বললাম পুলিশ অফিসে। মিঃ হারুন এবং পুলিশ ফোর্স নিয়ে এক্ষুণি আমি জামানের বাড়ি যাব।

কিন্তু--+--

মনিরা সেখানে আছে, এই তো?

হ্যাঁ।

সে কথা আমি সব বলে নেব হারুন সাহেবকে। মনিরাকে পাঠিয়ে আমি যেন তাকে গ্রেপ্তারের সুযোগ করে নিয়েছি।

ওগো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। মনিরাকে আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

তবে তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুণি বেরুবো, আমার মনে হয় সে এখনও বাড়িতে আছে। কারণ সে মনিরার জন্য অপেক্ষা করবেই।

❑

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করতেই বনহুর উঠে দাঁড়ালো। মনিরা গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর এগিয়ে এলো মনিরার পাশে। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে কাটলো।

বনহুরই প্রথমে কথা বলেন— আমি জানি তুমি আসবে, তাই আমি এতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

মনিরা নীরব।

বনহুর ওর চিবুক উঁচু করে ধরলো—মনিরা কি ভাবছো? খুব ঘৃণা হচ্ছে বুঝি?

এতক্ষণে মনিরা কথা বলেন— আমি তোমাকে ঘৃণা করি না, ঘৃণা করি বনহুরকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ আমি ভাবতেও পারি না জামান, তুমি দস্যু বনহুর।

মনিরা, মনিরা--- রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বনহুর মনিরাকে টেনে নিল কাছে।

মনিরা বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ালো— তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

মনিরা!

হ্যাঁ, তুমি অপবিত্র ঘৃণিত একটা মানুষ---

মনিরা, তুমি বিশ্বাস করো আমি অপবিত্র ঘৃণিত নই। আমি দস্যু নই। দস্যুতা আমার পেশা নয়। মনিরা তুমি আমাকে ঘৃণা করো না। পুনরায় বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

না না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও--- তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই, আমি চললাম।

না, তোমাকে আমি যেতে দেব না। মনিরাকে দক্ষিণ হাতে শক্ত করে ধরলো বনহুর। আরেক হাতে এক ঝটকায় নিজের জামার নিচে গলা থেকে সে হারছড়া টেনে বের করে মেলে ধরলো মনিরার সামনে— চিনতে পার এই ছবি দুটি কাদের?

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো মনিরা— এ ছবি তোমার গলায় এলো কি করে? এ যে আমার আর মনিরের ছবি।

বনহুর তখন মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন— তোমাদের সে হতভাগ্য মনির আর কেউ নয়— দস্যু বনহুর।

মনিরা আর্তনাদ করে উঠলো— জামান, তুমিই মনির? কেন- কেন তুমি এসব করতে গেলে?

বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরলো, তারপর বলেন— এই আমি তোমাকে স্পর্শ করে বলছি মনিরা, আর আমি দস্যুতা করবো না।

ঠিক সে মুহূর্তে মিঃ হারুনসহ চৌধুরী সাহেব কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁদের পেছনে পুলিশ ফোর্স।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর। বুঝতে পারলো সে, তার পিতাই আজ তাকে পুলিশের হাতে সপে দেয়ার জন্য আয়োজন করেছেন। পালালে সে এক্ষুণি পালাতে পারে। তার পায়ের তলাতে আছে এক চোরা সুড়ঙ্গ। এখনই সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ যে তার পিতাকে অপমান করা হবে।

মনিরার চোখেমুখেও বিস্ময়, হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মিঃ হারুন এগিয়ে গেল বনহুরের দিকে। বনহুর হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিল।

মিঃ হারুন নিজ হাতে বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মনিরা আর্তনাদ করে চৌধুরী সাহেবের জামার আস্তিন চেপে বলেন- মামুজান, এ তুমি কি করলে? এই দেখো--- মালাছড়া চৌধুরী সাহেবের হাতে দিল্ল মনিরা।

এমন সময় চৌধুরী সাহেবের গাড়ি থেকে নেমে এলেন মরিয়ম বেগম। কারণ মনিরার আর্তচিৎকার তার কানে পৌঁছে ছিল, ভাগ্নীর কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করেই তিনি ছুটে এলেন।

চৌধুরী সাহেব মালাছড়া হাতে নিয়েই চিনতে পারলেন। এ মালা যে তার অতি পরিচিত। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মালার লকেটের ছবি দুটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—এ মালা তুই কোথায় পেলি, মনিরা।

মনিরা আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখিয়ে বলেন— ওর গলায়।

অবাক হয়ে তাকান চৌধুরী সাহেব বনহুরের দিকে।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে— মামুজান, ঐ তোমাদের সন্তান মনির।

চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম স্থির নয়নে দেখতে লাগলেন বনহুরকে। তাঁদের চোখের সামনে বনহুরের মুখ মিশে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠলো একটা শিশু মুখ।

মরিয়ম বেগম ছুটে গিয়ে বনহুরকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে— বাবা মনির! আমার মনির----

চৌধুরী সাহেবের গণ্ড বেয়ে ঝর ঝর করে তখন ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। মনকে তিনি কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছেন না।

মরিয়ম বেগম উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেংগে ছিল, স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন— ওগো, কি করলে তুমি? হারানো রত্ন ফিরে পেয়ে আবার তুমি হারালে। না না, আমি মনিরকে কিছুতেই দূরে নিয়ে যেতে দেব না। দেব না--- মনির আমার মনির---- পুত্রের বুকে মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলেন মরিয়ম বেগম।

মিঃ হারুন কঠিন কণ্ঠে বলেন—বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বনহুরের শান্ত ধীরস্থির গলায় বলেন— চলুন, ইন্সপেক্টার সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী সাহেব পুত্রের হাত চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন— বাবা মনির!

বনহুর হেসে বলেন— আব্বা, আপনার কর্তব্য আপনি পালন করেছেন।

একবার মা ও মনিরার দিকে তাকায় বনহুর, উভয়ের চোখেই পানি, বনহুরের চোখ দুটোও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো— মনির, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো!

পরবর্তী বই

দস্যু বনহুরের নতুন রূপ

এ, এইচ, এম, মুহিত
বই লাভারস পোলাপান

দস্যু বনহুরের নতুন রূপ –২

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

□

গাঢ় অন্ধকারে গোটা পৃথিবী আচ্ছন্ন। আকাশে দু'একটি তারকা ক্ষুদে বিড়ালের চোখের মত মিটমিট করে জ্বলছে। বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়ছে না। চারদিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অন্ধকারে বিরাট বিরাট গাছ এক একটা দৈত্যের মতই মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ। এছাড়া কোন শব্দই নেই যেন দুনিয়ায়।

অন্ধকারের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে শহরটাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। শহরের বিশিষ্ট স্থানে বিরাট আকাশচুম্বী প্রাচীরে ঘেরা হাঙ্গেরী কারাগার।

সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এই কারাগারের একটি কক্ষে বন্দী দস্যু বনহুর। সশস্ত্র পুলিশ রাইফেল হাতে অবিরত সজাগ পাহারা দিচ্ছে। নিস্তব্ধ কারাগার কক্ষে শুধু জেগে উঠেছে সজাগ প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ—খট্ খট্ খট্।

□

গভীর রাত।

কারাগারের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং শব্দে রাত দুটো ঘোষণা করলো। মেঝেতে পাতা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো দস্যু বনহুর, নিজ মনে একটু হাসলো সে। তারপর দ্রুতপদে কারাগার কক্ষের পেছন দিকে এগিয়ে গেল। কাপড়ের ভেতর থেকে বের করলো একটা সিলক কর্ড। কর্ডখানা ছুড়ে মারলো দেয়ালের গায়ে প্রায় দশ বারো হাত উঁচুতে ভেন্টিলেটার লক্ষ্য করে। একবার, দু'বার, তিনবার, আটকে গেল কর্ডখানা ভেন্টিলেটারের সঙ্গে। বনহুর আর বিলম্ব না করে কর্ড বেয়ে দ্রুত উপরে উঠতে লাগলো মসৃণ দেয়ালে কিছুতেই প্যা আটকাচ্ছিল না, অতি কষ্টে উঠতে লাগলো। কারাকক্ষ অন্ধকার, তাই পাহারাদারগণ টেরও পেল না। বনহুর অতিকষ্টে একেবারে ভেন্টিলেটারের পাশে পৌঁছে গেল।

বনহুরের সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে। বার বার হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিচ্ছিলো সে। কর্ডদাঁতে চেপে ধরে ভেন্টিলেটারের শিক হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বনহুর, তারপর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিকে চাপ দেয়। অদ্ভুত শক্তি বনহুরের শরীরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেন্টিলেটারের শিক বাঁকিয়ে

ফেলে সে। একজন বের হতে পারবে, এতটুক ফাঁক করে নিয়ে বনহুর নিঃশ্বাস ফেলে। এবার আর তাকে কে পায়। সে দ্রুত ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে কক্ষের ও পাশে গিয়ে পৌঁছে। বনহুর কর্ডখানা খুলে পুনরায় কাপড়ের নিচে আন্ডার ওয়্যারের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। এবার সে দেয়াল বেয়ে অতি নিপুণতার সঙ্গে নিচে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন পাহারাদার দেখে ফেললো তাকে। বনহুরকে লক্ষ্য করে রাইফেল উঁচু করে গুলি ছুড়লো। বনহুর চট করে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আত্মরক্ষা করলো এবং পরক্ষণেই ছুটে এসে জাপটে ধরলো পাহারারত পুলিশটিকে। বলিষ্ঠ হাতের কঠিন চাপে পাহারাদারটির হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে ছুটতে লাগলো সে কারাগারের ফটক অভিমুখে।

রাইফেলের গুলির শব্দে চারদিক থেকে অন্য পাহারাদারগণ শশব্যস্তে ছুটে এলো। মুহূর্তে কারাগারের মধ্যে বন্দী পালানোর সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলো।

বনহুরকে লক্ষ্য করে সমস্ত পুলিশ ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর কখনও থামের আড়ালে, কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে আত্মগোপন করে ফটকের দিকে এগুতে লাগলো।

ইতোমধ্যে গোটা হাঙ্গেরী কারাগার প্রকম্পিত করে বিপদ সংকেত ধ্বনি হতে লাগলো। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হাতে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো।

বনহুর অতি সাবধানে এগুচ্ছে ফটকের দিকে। কয়েকজন পুলিশ উদ্যত রাইফেল হাতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। বনহুর একটা টবের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে রইলো। পুলিশের দল সরে যেতেই আবার এগুতে শুরু করলো সে।

অতি অল্প সময়ে ফটকের নিকট পৌঁছে গেল বনহুর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিশ তার সামনে রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

পেছনে অসংখ্য পুলিশ ছুটে আসছে। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। কালবিলম্ব না করে বনহুর সামনে পুলিশ দু'জনকে লক্ষ্য করে কর্ডটা ছুড়ে মারে। হঠাৎ এমন বিপদের জন্য তৈরি ছিল না পুলিশদয়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল ওরা। তাদের হাতের রাইফেল ছিটকে পড়লো দূরে। বনহুর দ্রুতহস্তে কর্ডখানা ওদের শরীর থেকে খুলে নিয়ে ছুড়ে মারলো ফটকের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ডখানা আটকে গেল। বনহুর কোমরের বেল্টে রিভলভার খানা গুজে রেখে দ্রুত কর্ডবেয়ে ফটকের মাথায় উঠে গেল।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী ফটকের নিকটে পৌছে গেছে। কয়েকজন পুলিশ বনহুরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। কিন্তু তখন বনহুর লাফিয়ে পড়েছে ফটকের ওপাশে।

ফটকের ওপাশে যে দু'জন পুলিশ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিলো, তারা বনহুরকে দেখামাত্র রাইফেল উঁচু করে ধরে। একজন গুলি ছুঁড়ে বনহুরের বুক লক্ষ্য করে, বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়, গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হয় অপর পুলিশের বুকে।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে পুলিশটা।

অপর পুলিশ পুনরার রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়তে যায়, কিন্তু বনহুর তার পূর্বেই রিভলভারের এক গুলিতে পাহারাদার পুলিশকে তার সঙ্গীর সঙ্গে পরপারে পাঠিয়ে দেয়।

তারপর ছুটতে থাকে সম্মুখের দিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ফটক খুলে পুলিশ ফোর্স বেরিয়ে এলো, সবাই ছুটতে লাগলো এদিকে সেদিকে। কোন দিকে গেছে বনহুর কেউ জানে না।

হাঙ্গেরী কারাগারে বিপদ সংকেত ঘণ্টা অবিরাম গতিতে বেজে চলেছে।

বনহুর ছুটতে ছুটতে রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

তার পাশ কেটে চলে গেল একটা পুলিশ ভ্যান। ভ্যানে বিশ-পঁচিশজন পুলিশ রাইফেল উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। কার-খানা চলে গেলে বনহুর সোজা হয়ে বসলো।

অল্পক্ষণেই সমস্ত শহরে হাঙ্গেরী কারাগারের বিপদ-সংকেত ধ্বনি ছড়িয়ে ছিল। সবাই আন্দাজ করে নিল নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

বনহুর বন্দী হওয়ার গোটা শহরে একটা শান্তি ফিরে এসেছিল। আবার নগরবাসীদের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে পড়লো।

বনহুর ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে কোন গাড়ির প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ইতোমধ্যে আর একটি পুলিশ ভ্যান সে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বনহুর হামাগুড়ি দিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ যদি কোন পুলিশ তাকে দেখে ফেলে, তাহলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে হাঙ্গেরী কারাগারকক্ষে।

বনহুর এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে দেখছে। হঠাৎ দেখতে পেল ষ্টেশনের দিকে থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ি সে পথে এগিয়ে আসছে। হয়তো বা কোন ট্রেনযাত্রী হবে। গাড়ির সামনে বেডিংপত্র রয়েছে।

বনহুর এ সুযোগ নষ্ট করলো না। পথের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে। লাইটপোস্টের ক্ষীণালোকে দেখল কোচোয়ান গাড়ির ওপরে বসে লাগামটা শক্ত করে ধরে আছে। তার দক্ষিণ হাতে চাবুক। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে চাবুকখানা সপাং করে গিয়ে পড়ছে।

গাড়িখানা বনহুরের পাশে আসতেই সে ক্ষিপ্র হস্তে গাড়ির দরজা ধরে পাদানীতে উঠে দাঁড়ায় এবং এক মুহূর্তে বিলম্ব না করে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে।

গাড়ির ভেতরে একটি যুবক বসে বসে ঝিমাচ্ছিল। বনহুর তাকে কিছু বুঝার সময় না দিয়ে তার মুখটা শক্ত করে চেপে ধরলো। সে লক্ষ্য করলো যুবকটা হিন্দু, কারণ তার শরীরে ধুতি আর পায়জামা। এতে বনহুরের সুবিধা হলো, ধুতির আঁচল দিয়ে অতি সহজেই যুবকটিকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো। পূর্বেই যুবকের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে গুঁজে দিয়েছিল সে তার মুখের মধ্যে, কাজেই যুবক একটু শব্দও করতে পারল না। যুবকের হাত-পা মজবুত করে বেঁধে গাড়ির মেঝেতে ফেলে দেয় বনহুর।

কোচোয়ান একবার চিৎকার করে বলে—বাবু, অত নড়াচড়া করছেন কেন?

বনহুর একটু কেশে জবাব দেয়—বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে, তাই দরজা জানালার শার্শী লাগিয়ে দিচ্ছি।

কোচোয়ান আর কোন কথা বলে না।

বনহুর অতি সহজেই কাজ সমাধা করে ফেললো। এবার বনহুর দেখতে পেল, গাড়ির মধ্যে একটি সুটকেস রয়েছে। বনহুর যুবকের পকেট থেকে চাবি নিয়ে সুটকেসটা খুলে ফেললো। যুবকের পকেটেই একটা ম্যাচ ছিল, বনহুর ম্যাচ জ্বেলে দেখলো তার মধ্যে যুবকের প্যান্ট—শার্ট-কোট রয়েছে। আরও অনেক কিছু রয়েছে সুটকেসে। বনহুর চটপট প্যান্ট-শার্ট আর কোট গায়ে পরে নিল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বনহুরের মতই ছিল যুবকটির শরীরের মাপজোক, তাই কোন অসুবিধা হলো না। কিন্তু এবার বিপদে

ছিল সে। প্যান্ট-সার্ট-কোটতো হলো, কিন্তু জুতো যে নেই তার পায়ে। হঠাৎ খেয়াল হলো যুবকের পায়ে নিশ্চয়ই জুতো আছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে যুবকের পা থেকে জুতো খুলে নিল, মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো, জুতো জোড়া যদি তার পায়ে না হয়, তবে মহা মুশকিল হবে। বরাত ভালো তাই জুতো জোড়াও তার পায়ে মাপমত হয়ে গেল।

আসনে বসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর। তাদের গাড়ির পাশ কেটে আরও কয়েকখানা পুলিশ ভ্যান চলে গেল। হাসলো বনহুর। গাড়িতে বেডিংপত্র দেখে ফোর্স কোনরূপ সন্দেহ করেনি।

তখনও দূর থেকে ভেসে আসছে হাঙ্গেরী কারাগারের বিপদ সংকেত ধ্বনি।

বনহুরকে নিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গাড়িখানা একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন এক পৌঢ় ভদ্রলোক। ব্যস্তকণ্ঠে তিনি ডাকাডাকি শুরু করলেন—ওরে মহেন্দ্র! ওরে মাধু। জামাইবাবুর গাড়ি এসেছে। ওরে জামাইবাবুর গাড়ি এসেছে।

বনহুর চমকে উঠলো সর্বনাশ, সে তাহলে জামাই বনে গেল। কিন্তু এখন কোন উপায় নেই, তাকে জামাই সেজেই চালিয়ে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি যুবকের গলায় জড়ানো মাফলারটা খুলে নিয়ে বেশ করে জড়িয়ে নিল নিজের গলায়। তারপর একটু কেশে বলেন—অত চেঁচামেচি করবেন না, ঠাণ্ডা লেগে মাথাটা বড্ড ধরেছে । তারপর কোচোয়ানকে লক্ষ্য করে বলে—এই! তুমি বেডিং পত্রনামিয়ে একটু ভেতরে পৌছে দাও।

কোচোয়ান তার আসন থেকে নেমে বেডিংপত্র নামাতে শুরু করে। বনহুর নিজের হাতে সুটকেসটা নামিয়ে নেয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আহ, থাক থাক। ওরে মহেন্দ্র! এদিকে আয় না, জামাই বাবু নিজেই তো জিনিসপত্র নামিয়ে নিচ্ছেন।

মহেন্দ্র নামে যে লোকটি এসে হাজির হল, সে তখন নিদ্রার ঘোরে চোখ রগড়াচ্ছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বনহুরের হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে মহেন্দ্রের হাতে দিয়ে বলেন—যা, ভেতরে নিয়ে যা, আর শুন, কোচোয়ানকে দেখিয়ে দে বেডিংপত্র কোথায় রাখবে। তারপর বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে—এসো বাবা এসো।

বনহুর ভদ্রলোকটিকে অনুসরণ করে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—আচ্ছা বাবা, গণেশ বলে কাউকে স্টেশনে দেখনি। সে কই?

বনহুর খানিকটা কেশে নিয়ে বলে—কই, কাউকেই তো স্টেশনে দেখলাম না।

তবে নিশ্চয়ই বেটা কোথাও শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ভাগ্যিস বাসার ঠিকানাটা তোমাকে ভালভাবে জানিয়ে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, সেজন্যই বেশি বেগ পেতে হলো না!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠেন—ট্রেনে বুঝি খুব ঠাণ্ডা লেগেছে।

হ্যাঁ।

তাই তো গলাটা যেন কেমন শুনা যাচ্ছে।

বনহুর আঁতকে উঠে বারবার কাঁশতে শুরু করে। তারপর কাশি থামিয়ে বলে—উঃ গলাটা বড্ড ব্যথা করছে।

উঠানে পৌঁছতেই কয়েকজন মহিলা ঘিরে ধরলো বনহুরকে, প্রৌঢ় ভদ্রলোক একজন অর্ধবয়সী মহিলাকে দেখিয়ে বলেন—উনি তোমার শাশুড়ী মাতা।

বনহুর থতমত খেয়ে কি করবে ভাবছে, হঠাৎ মনে ছিল হিন্দুরা গুরুজনকে প্রণাম করে। বনহুর নত হয়ে বয়স্ক মহিলার পদধূলি গ্রহণ করলো।

মহিলা বনহুরের মাথায় হাত রেখে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

মহিলাগণ কানাকানি শুরু করেছে, শুনতে পেল বনহুর—মাধুরীর বর তো খুব সুন্দর হয়েছে। চমৎকার ছেলে, যেন কার্তিক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন—আমি আগেই বলেছিলাম, আমার পছন্দ আছে ।

বনহুর ভেতরে ভেতরে বিব্রত বোধ করতে লাগলো। সে জীবনে অনেক কঠিন বিপদ হাসিমুখে জয় করেছে, কিন্তু কোনদিন এমন বিপদে পড়েনি। একেবারে জামাই বনে গেছে। যাক তবু এতক্ষণ ঠিকভাবে চালিয়ে নিতে পেরেছে এই যথেষ্ট। কিন্তু এরপর আরও যদি কিছু সমস্যা এসে যায়, তখন তার উপায় কি হবে? এক্ষুণি ইচ্ছা করলে পালাতে পারে সে। শত শত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে যে অদৃশ্য হতে পারে, তার কাছে

সামান্য ক'জন নিরীহ প্রাণী এ কিছু নয়, কিন্তু হঠাৎ এদের কাছে নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারে না। কাজেই নিশ্চুপ থেকে যায়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে ওঠেন—মাধুরী কই? ঘুমিয়েছে বুঝি। মহিলাদের একজন বলে ওঠেন—জামাইবাবু আসবেন বলে এতক্ষণ সে জেগেই ছিল। এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওকে ডাকছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—তাই ডাকো বৌমা, ঘুম ভাঙ্গলে দেখবে কে এসেছে।

মহিলা ডাকতে ডাকতে কক্ষের দিকে চলে যান—মাধুরী দি মাধুরী দি, দেখো গিয়ে কে এসেছে।

বনহুর ঢোক গিললো। এইবার তার চরম পরীক্ষা। মাধুরী তবে ঐ যুবকের স্ত্রী। এবার তার সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু এতক্ষণেও তাকে এ বাড়ির কেউ চিনতে পারছে না। ব্যাপার কি? আশ্চর্য লাগে বনহুরের কাছে।

প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা বলেন—পথে কোন কষ্ট হয়নি তো বাবা?

না, শুধু ঠাণ্ডা লেগে গলাটা যা বসে গেছে। কথাটা বলেন বনহুর।

ভদ্রলোক ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন—এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েই কথা বলবে, না ঘরে নিয়ে বসাবে?

শাশুড়ী বলে ওঠেন—দেখ বাবা, আমরা তো তোমাকে দেখিনি। এমন কি এ বাড়ির কেউ তোমাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি। মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে দিদি বিয়েটা দিয়ে দিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—কেন জামাই কি অপছন্দ হয়েছে?

বলো কি জামাই অপছন্দ হবে, এ যে সোনায় সোহাগা। যেমন মাধুরী তেমনি বাবা নিমাই।

এতক্ষণে জামাইয়ের নামটা জানতে পারে বনহুর। সে যুবকের নাম তবে নিমাই। হ্যাঁ, তাকে কিছুক্ষণের জন্য নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আর একটি কথা তাকে অনেকটা হালকা করে এনেছে, এ বাড়ির কেউ জামাইকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি। কিন্তু মাধুরী, সে তো নিশ্চয়ই তার স্বামীকে ভাল করে চেনে।

বনহুরকে ভাবতে দেখে বলেন ভদ্রমহিলা—কি ভাবছো বাবা, দিদি যা করেছেন খুব ভালো করেছেন। আমি ভাবতেও পারিনি এমন জামাই পাবো।

ভদ্রলোক বলেন—তোমার দিদির পছন্দ তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমার মাধুরীর স্বামী যেন রাজপুত্র। দেখ বাবা, মনে কিছু করো না,

মাধুরীকে বিয়ের দিনই নিয়ে না এলে ওর ঠাকুরমার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখাই হত না।

বনহুর ব্যথিত-কণ্ঠে বলে ওঠে—ঠাকুরমা তাহলে....

হ্যাঁ বাবা, তিনি মারা গেছেন, কেন তুমি চিঠি পাওনি?

বনহুর একটু চিন্তা করার ভান করে বলে—চিঠি, কই না তো তিনি কি সে দিনই....

হ্যাঁ, মাধুরীকে নিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছলাম, তার ঘণ্টাকয়েক পরেই মা মারা যান। মাধুরীও বুঝি তোমাকে একথা লিখে জানায়নি?

না।

তবে তোমাকে সব গোপন করে গেছে দেখছি। হঠাৎ কথাটা জানালে ব্যথা পেতে পারো তাই বুঝি মাধুরী লেখেনি।

বনহুর লক্ষ্য করলো ওপাশের দরজায় একটা সুন্দর মুখ ভেসে উঠে আবার আড়ালে সরে গেল।

মহিলাটি বলে ওঠেন—মাধুরী জেগেছে, যাও বাবা, ও ঘরেই খাবার পাঠিয়ে দেব। সব ঠান্ডা হয়ে গেছে কিনা, একটু গরম করে দিন।

বনহুর বলে ওঠে—না না, রাতে আর কিছু খাব না। বড্ড অসুস্থ বোধ করছি।

তাহলে একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না না, কিছু খাবো না।

শ্বশুর মহাশয় বলে ওঠেন—সেকি হয় বাবা? রাত্রে উপোস দিতে নেই। তুমি যাও বাবা, ঠাণ্ডায় অসুখ বাড়বে।

বনহুর ইতস্ততঃ করছে বলে একটি যুবতী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে—লজ্জা করছে, না? আসুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

বনহুর যুবতীর পেছনে চলতে চলতে ভাবে—তাদের জামাইয়ের এই প্রথম শ্বশুরালয়ে পদার্পণ। এ বাড়ির এক শ্বশুর মহাশয় ছাড়া জামাইকে কেউ বুঝি দেখে নি। তবু শ্বশুর মহাশয়ের চোখেও পাওয়ার ওয়ালা চশমা। কিন্তু জামাইবাবুর স্ত্রী সে তো তার স্বামীকে সহজেই চিনে নেবে। তখন পেছন থেকে যুবতীটি বলেন—এবার যান, সোজা ভেতরে চলে যান....

বনহুর থমকে দাঁড়ায়, কেশে নিয়ে বলে—আজ না হয় রাতের মত অন্য ঘরে।

কথা শেষ করতে দেয় না যুবতী—রাগ দেখছি আপনার পড়েনি। বিয়ের রাতেই মাধুরী চলে এসেছিল বলে এখনও অভিমান। যান যান, ভেতরে যান।

বনহুর দেখলো বেশি আপত্তি করা ঠিক হবে না। ধীরে পদক্ষেপে মাধুরীর কক্ষে প্রবেশ করে। দেখতে পায় লজ্জায় জড়োসড়ো একটি যুবতী মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে খাটের একপাশে।

বনহুর বিব্রত বোধ করে। একি অদ্ভুত পরীক্ষায় ছিল সে। নিজেকে সংযত করে একটু কেশে নিয়ে বলেন—মাধুরী।

ঘোমটার ফাঁকে লজ্জা ভরা দৃষ্টি তোলে একবার তাকালো মাধুরী তার দিকে।

বনহুর আরও এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। তারপর বলেন—ভালো আছো-তো মাধুরী?

মাধুরী মৃদু মধুর কণ্ঠে বলেন—আছি।

বনহুরের মত বীরপুরুষও ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলো। এবার কি কথা বলবে সে? একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হলো, মাধুরী তাকে এখনও চিনতে পারেনি। নইলে সে এতক্ষণ অমনভাবে নিশ্চুপ থাকতো না।

বনহুর খাটে না বসে একটা সোফায় বসে পড়ে বলেন—হঠাৎ ভয়ানক সর্দি-কাশি হওয়ায় গলাটা কেমন বসে গেছে।

মাধুরী আড়নয়নে একবার বনহুরকে দেখে নিল, তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়ালো তার পাশে—ওগো তোমার রাগ পড়েছে?

বনহুর চটপট কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। কাশতে শুরু করে, পরে কাশি থামিয়ে বলে—রাগ করে আর কতদিন থাকা যায় বল।

মাধুরী ঘোমটা অনেকটা সরিয়ে ফেলেছে। আরও ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দভরা কণ্ঠে বলে—সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি এত অল্প সময়ে তুমি এতটা বদলে যাবে। বিয়ের রাতের কথাটা আজও আমার মনে আছে। বাসর ঘরে যাবার পূর্বেই মায়ের চিঠি বাবার হাতে এসে পৌছলো—ঠাকুর মার অসুখটা ভয়ানকভাবে বেড়েছে, দেখা করতে হলে রাতের ট্রেনে আসবে। তুমি তো রেগে অস্থির, বিয়ের রাতে কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না। দেখ দেখি সেদিন যদি বাবার সঙ্গে আমি না আসতাম, ঠাকুরমার সঙ্গে আর জীবনে দেখা হত না।

বনহুর অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। এবার সে বুঝতে পারলো এখানে ঠাকুরমার অসুস্থতার জন্য মাধুরীকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঠাকুরমার অসুস্থতার জন্যই বিয়েতে মেয়ের মা ও বাড়ির কেউ যেতে পারেনি। শুধু মেয়ের বাবা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিয়েটা দিয়ে এসেছেন। এমন কি বিয়ের রাতেই মাধুরীসহ তার পিতাকে চলে আসতে হয়েছিল, মাধুরী ভালো করে স্বামীকে দেখার সুযোগও পায়নি। মনে মনে খুশি হলো বনহুর।

বনহুর মাধুরীর কথায় দুঃখভরা কণ্ঠে বলেন—ঠাকুরমার মৃত্যুতে আমিও ভীষণ দুঃখিত, মাধুরী।

সে কথা তোমার চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

মাধুরী অলক্ষ্যে দেয়ালঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় বনহুর। রাত ভোর হবার আর মাত্র ক'ঘণ্টা বাকী। হাই তোলে বনহুর—মাধুরী, অনেক রাত হয়েছে। শরীরটাও ভালো লাগছে না, একটু ঘুমাবো।

বেশ তো শুয়ে পড়ো। মাধুরী নিজ হাতে বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিতে থাকে। মাধুরীর মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। বনহুর নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো মাধুরীর মুখের দিকে । মাধুরী সুন্দরী বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে জামাটা খুলে মাধুরীর হাতে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ছিল। ইস, আজ ক'দিন এমন নরম বিছানায় শোয়নি বনহুর। কারাগারের কঠিন মেঝেতে আজ তিন চারটা দিন কেটেছে। ভাগ্যিস রহমান বুদ্ধি করে কডটা তার নিকটে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কর্ডটা তার অনেক উপকারে এসেছে। তাছাড়া বনহুরকে আটকে রাখে এ কার সাধ্য।

মাধুরী আলনায় জামাটা রেখে বিছানায় এসে বসে। বনহুর ঘেমে ওঠে ভয়ে নয় সঙ্কোচে, মিথ্যা অভিনয় তাকে করতে হচ্ছে।

মাধুরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

উভয়ে নীরবে তাকিয়ে রইলো উভয়ের দিকে। মাধুরীর মনে কত আশা—আনন্দ, স্বামী তাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেবে কিন্তু একি, এমন তো সে আশা করেনি।

মাধুরী বলে ওঠে—অমন করে কি দেখছো?

বনহুর হেসে বলে—তোমাকে। সত্যি মাধুরী তুমি কত সুন্দর। কথাগুলো বলে নিজেই লজ্জাবোধ করে সে।

মাধুরী যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বনহুর ততই সরে যায়। নিজকে মাধুরীর নিকট থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখে সে।

মাধুরী কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে খুব ব্যথা অনুভব করলো। কই, এ পর্যন্ত তাঁর স্বামী তো তাকে কোন সাদর সম্ভাষণ জানালো না। তবে কি এখনও তার মনে অভিমান দানা বেঁধে রয়েছে। মাধুরী বনহুরের বুকে মাথা রাখলো—ওগো এখনও তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারলে না।

বনহুর নিজকে সংযত করে রাখে। হাত দু'খানা দিয়ে নিজের মাথার চুলগুলো এটে ধরে বলে—মাধুরী, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি, তাই....

বুঝেছি ঘুম পাচ্ছে তোমার।

হ্যাঁ মাধুরী।

কিন্তু আমার যে ঘুম পাচ্ছে না। কতদিন তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি।

আমি তা জানি মাধুরী। কিন্তু আমার মাথাটা এত ধরেছে তোমায় কি বলবো....

বেশ তুমি ঘুমোও, আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

বনহুর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলো।

মাধুরী বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল বুলিয়ে চললো। কক্ষের স্বল্প আলোতে মাধুরী বনহুরের মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলো। সেদিন স্বামীকে এমন করে দেখার সুযোগ ঘটেনি তার। এত কাছে—এত ঘনিষ্ঠ করেও পায়নি। তবে শুভদৃষ্টির সময় দেখেছিল একটু। কই, সেদিন তো তার স্বামীকে এত সুন্দর বলে মনে হয়নি। অপূর্ব অপরূপ তার স্বামী। আনন্দে মাধুরীর হৃদয় ভরে ওঠে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে মাধুরী বনহুরের মুখে।

বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে মাধুরী। বনহুরের একটু তন্দ্রামত এসেছিল, সজাগ হয় সে। রাত ভোর হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। বনহুর চোখ মেলে তাকালো। মাধুরী তার গায়ের উপর হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বনহুর মাধুরীর হাতখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে রেখে উঠে বসলো। তারপর দ্রুতহস্তে পাশের বন্ধ জানালা খুলে ফেললো। এবার ফিরে তাকালো সে মাধুরীর ঘুমন্ত মুখে। তারপর টেবিলের পাশে গিয়ে একখণ্ড কাগজ আর

কলম তুলে নিয়ে খচ খচ করে লিখল, "বিপদে পড়ে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ক্ষমা করো মাধুরী।"

—দস্যু বনহুর

কাগজখানা টেবিলে ভাজ করে চাপা দিয়ে রেখে মুক্ত জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছিল বনহুর অন্ধকারের অন্তরালে।

❑

পুত্রশোকে চৌধুরী মাহমুদ খান আর মরিয়ম বেগম অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এতদিন তারা জানতেন মনির মরে গেছে! আর সে কোন দিন ফিরে আসবে না। হঠাৎ সে পুত্রকে অভাবনীয় অবস্থায় ফিরে পেলেন চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগম। কিন্তু এমন পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই ছিল তাঁদের পক্ষে ভালো।

মরিয়ম বেগম তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন, সদাসর্বদা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললেন। যে পুত্র ছিল তার জীবনের নয়নের মণি, যাকে হারিয়ে তিনি নিজেকে সর্বহারা মনে করতেন, সে হৃদয়ের নয়নের মণি, মনিরকে ফিরে পেয়ে আবার হারালেন। শুধু হারালেন নয়, নিজের হাতে তাকে বিসর্জন দিল।

স্ত্রীর অবস্থা দর্শনে চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব। তিনি নিজেও মনিরের জন্য অত্যন্ত কাতর ছিল। কিন্তু মনের ব্যথা মনে চেপে নিশ্চুপ রয়ে গেল। কোন উপায় নেই ওকে বাঁচাবার। চৌধুরী সাহেব সবচেয়ে বড় দুঃখ পেলেন, তাঁর পুত্র আজ ডাকু। সভ্য সমাজে তার কোন স্থান নেই।

মনিরা যে বনহুরকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, এ কথা বুঝতে পেরেছিল মামুজান আর মামী মা। বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় মনিরার হৃদয়েও যে ভীষণ আঘাত লেগেছে জানেন তাঁরা। চৌধুরী সাহেব লক্ষ্য করেছেন সেদিনের পর থেকে মনিরার মুখের হাসি কোথায় যেন অন্তর্ধান হয়ে গেছে। সর্বদা বিষণ্ন হয়ে থাকে সে।

অহরহ মনিরা নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে শুধু বনহুরের কথা ভাবে, কিছুতেই সে বনহুরকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে না। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে মনিরা বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানার দিকে। নির্মল দীপ্ত

দুটি চোখ কি সুন্দর! আজও ঐ দুটি চোখের চাহনি মনিরার হৃদয়ে গেঁথে আছে। বনহুর বন্দী হয়েছে সত্য কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য মনিরা তাকে বিস্মৃত হতে দেখেনি।

চৌধুরী সাহেব পুত্রশোকে মুহ্যমান। মরিয়ম বেগম শয্যাশায়ী, মনিরার অবস্থাও তাই। গোটা চৌধুরী বাড়ি একটা নিস্তব্ধতা ও বিষাদে ভরে উঠেছে। কোথাও যেন এ বাড়িটার এতটুকু আনন্দ নেই।

চৌধুরী সাহেব সেদিন নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে পুত্র সম্বন্ধেই চিন্তা করছিল। নৌকাডুবির পর মনির কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে সে জীবনে বেঁচে আছে,কে তাকে লালন-পালন করলো, লেখাপড়া শিখে মানুষ না হয়ে, কেমন করে হলো সে ডাকু—

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম। বিষণ্ন মলিন মুখ মণ্ডল। স্বামীর পাশের সোফায় বসে বলেন—ওগো, বাছাকে উদ্ধারের কোনই কি উপায় নেই?

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল—না।

তারপর উভয়েই নীরব, গোটা কক্ষে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মরিয়ম বেগম পুনরায় স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন—কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই মানছে না।

জানি, কিন্তু কোন্ উপায় নেই।

নাগো ও কথা বলো না। তুমি একবার ইন্সপেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করে—

অসম্ভব। একটা ডাকাতের জন্য আমি নিজেকে হেয় করবো?

ডাকাত হলেও সে আমাদের সন্তান।

তুমি কি পাগল হলে মরিয়ম? আমার পুত্র বলে দোষীকে তারা ছেড়ে দেবে না। ন্যায্য বিচারে তার যে দণ্ড হবে, তাই মেনে নিতে হবে।

ওগো, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমার মনিরের যদি যাবৎ জীবন কারাদণ্ড হয়....

শুধু কারাদণ্ড নয়, তার ফাঁসিও হতে পারে।

বাপ হয়ে তুমি এ কথা মুখে আনতে পারলে? ওগো, আমার মণিকে তুমি বাঁচিয়ে নাও।

মনিরা কখন আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে মামা-মামীমার কথাবার্তা শুনছিল কেউ জানে না। চৌধুরী সাহেবের শেষ কথায় মনিরা দু'হাতে বুক চেপে বসে পড়ে মেঝেতে। বনহুরের ফাঁসি হতে পারে—

আর সহ্য করতে পারে না মনিরা। উঠে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে ফিরে যায়। দেয়াল থেকে—বিছানা খানা নিয়ে দু'হাতে বুকে [illegible] কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলো সে—মনির, আবার কেন তুমি আমার জীবন পথে এসে দাঁড়িয়েছিলে?

মনিরার চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠে ফটোখানা।

বনহুর বন্দী হয়েছে জানতে পেরে নূরীর ধমনীর রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারে না দস্যু বনহুরকে কেউ বন্দী করতে পারে। তখনই নূরী পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে বলে—আমি বনহুরকে উদ্ধার করতে চাই। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

কিন্তু বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান তাকে ক্ষান্ত করে। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—নূরী, উপায় থাকলে আমরা এখনও নিশ্চুপ থাকতাম না। হাঙ্গেরী কারাগার—তা অতি ভীষণ জায়গা। হাজার হাজার পুলিশ ফোর্স অবিরত কড়া পাহারা দিচ্ছে। প্রকাশ্যে সেখানে কোন কিছুই করতে পারা যাবে না। আমি গোপনে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি। তাছাড়া নূরী তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, সর্দারকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

নূরীর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠলো। কিন্তু একেবারে আশ্বস্ত হয় না সে, যতক্ষণ বনহুর ফিরে না আসছে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নয় নূরী।

একদিন দু'দিন করে পাঁচটা দিন চলে গেছে। যে নূরী একটি দিন বনহুরকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে, সে নূরী আজ কদিন বনহুরকে কাছে পায়নি।

শুধু নূরীই নয়, বনহুরের অন্তর্ধানে তার সমস্ত অনুচরবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে গোটা বনভূমি।

সবচেয়ে তাজের অবস্থা দুঃখজনক। বনহুর বন্দী হবার পর তাজ কেমন যেন হয়ে গেছে। ঘাস ছোলা কিছু সে মুখে নেয় না। বনহুর তাজকে নিজ হাতে ঘাস ছোলা খাওয়াতো। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতো। বনহুরের অনুপস্থিতিতে সে অবিরত সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করত। কথা বলতে পারে না তাজ, মনের অবস্থা সে এমনি করে ব্যাক্ত করত।

বনহুরের অনুচরগণ তাজের জন্য চিন্তিত হয়ে ছিল। না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বে তাজ। এই অশ্বই হচ্ছে বনহুরের সবচেয়ে প্রিয়।

সেদিন নূরী অনেক চেষ্টায় গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে একটু ছোলা আর ঘাস খাইয়েছে তাজকে, কিন্তু এমনি করে আর ক'দিন ওকে বাঁচানো যাবে।

সর্দারের বিনা অনুমতিতে দস্যুগণ কিছুই করতে পারবে না। তাই তারা নীরব হয়েছে।

নূরী ঝরনার ধারে বসে গান গায়। বনে বনে ঘুরে ঘুরে চোখের পানি ফেলে। যেদিকে তাকায় শূন্য বনভূমি খাঁ খাঁ করেছ। বনহুরকে নূরী নিজের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে। বনহুর ছাড়া আর কেউ যেন নেই ওর। অবশ্য সে কথা মিথ্যে নয়, এ বনে বনহুরই একমাত্র সঙ্গী—একমাত্র সম্বল।

বনহুরকে কেন্দ্র করে নূরী কত আকাশ-কুসুম গড়ে আর ভাঙে বনহুর তার স্বপ্ন—তার সব।

সেদিন নূরী তার নিজের কক্ষে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। কই আজও তো বনহুর ফিরে এলো না। রহমান নিশ্চয়ই কোন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। বনহুরকে না জানি হাঙ্গেরী কারাগারে কি কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে! নূরীর চিন্তার অন্ত নেই। বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে নূরী।

ঠিক এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, নূরীকে বালিশে মুখ গুজে ফঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে ডাকে—নূরী।

মুহূর্তে নূরী চোখ তুলে তাকায়। আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়ে সে বনহুরের বুকে—হুর!

বনহুর নূরীর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—নূরী, খুব কেঁদেছো বুঝি এ কদিন?

হুর, আমার মন বলেছে কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না, তোমাকে বন্দী করে রাখতে কেউ সক্ষম হবে না।

তোমার বিশ্বাস মিথ্যা নয় নূরী। বনহুরকে আটকে রাখে কার সাধ্য। সামান্য পুলিশ বাহিনী বন্দী করে রাখবে আমাকে! হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঙ্গেরী কারগারও বনহুরকে আটকে রাখতে সক্ষম হলো না, নূরী।

নূরী দীপ্ত প্রফুল্ল মুখে বনহুরের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে তার মধ্যে দেখতে পায় এক নতুন রূপ।

□

চৌধুরী সাহেব, মরিয়ম বেগম এবং মনিরা চায়ের টেবিলের পাশে এসে বসে, সকলের মুখেই বিষণ্নতার ছাপ।

বাবুর্চি চা-নাস্তা পরিবেশন করছিল, এমন সময় বয় খবরের কাগজ এনে টেবিলে রাখে।

একসংগে চৌধুরী সাহেবের এবং মনিরার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে পত্রিকা খানার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়মাখা আনন্দ ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করেন চৌধুরী সাহেব—হাঙ্গেরী কারাগার হতে দস্যু বনহুরের পলায়ন। শত শত পুলিশ বাহিনী তাকে আটকিয়ে রাখতে অক্ষম।

আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মরিয়ম বেগম—সত্যি আমার মনির কারাগার থেকে পালিয়েছে? সত্যি বলছো?

হ্যাঁ গো, এই দেখ? চৌধুরী সাহেব পত্রিকার উপরের পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখাগুলো দেখিয়ে দেন।

মরিয়ম বেগম ইংরেজি জানতেন না, তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন—সমস্তটা পড়ে আমায় বুঝিয়ে বল না গো। আমার মনির কারাগার থেকে পালিয়েছে। না জানি বাছা আমার কোথায় আছে কেমন আছে।

মনিরার চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে। মনির কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ইস কি আনন্দ—কি শান্তি। নিশ্চয় সে আসবে। যেমন করে হউক সে আসবে তার কাছে। মনিরা আনন্দের আবেগে আর স্থির হয়ে বসতে পারে না, ছুটে বেরিয়ে যায় সে। নিজের ঘরে গিয়ে বনহুরের ছোটবেলার ফটোখানা খুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে—ওগো তুমি মুক্ত হয়েছ। জানি কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। কেউ না..

চৌধুরী সাহেব নিজেই সমস্তটা পড়ে নিয়ে স্ত্রীকে মানে করে বুঝিয়ে বলেন। পুত্র-কন্যা যত দোষে দোষীই হউক না কেন, পিতা-মাতার নিকটে তারা স্নেহের পাত্র। কোন পিতামাতাই পুত্র কন্যার অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। মনির আজ দস্যু জেনেও চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম তাকে ঘৃণা করতে পারে না। কারাগার থেকে পালিয়েছে জেনে মনে মনে খুশি হলেন তাঁরা। কিন্তু একেবারে আনন্দ লাভ করতে পারলেন না। কারণ, কারাগার থেকে মনির পালিয়েছে সত্য কিন্তু সে নিরাপদ নয়। অহরহ তাকে পুলিশ বাহিনী খুঁজে ফিরছে। পুলিশ সুপার ঘোষণা করে দিয়েছে, যে দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় এনে দিতে পারবে তাকে লাখ টাকা

পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়াও তাকে একটা বীরত্বপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করা হবে।

❑

মরিয়ম বেগম বার বার খোদার নিকট বনহুরের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন। চোর হউক, ডাকু হউক সে সন্তান। হে খোদা তুমি আমার মনিকে রক্ষা কর। মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন—যে সন্তান মানুষ নামে কলঙ্ক, তার জন্য ভেবে কি হবে বল। মনে কর মনির বেঁচে নেই।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন মরিয়ম বেগম—বাপ হয়ে তুমি এ কথা বলতে পারলে?

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বলেন চৌধুরী সাহেব—সবই আমাদের অদৃষ্ট, নইলে অমন ছেলে ক'জনের ভাগ্যে জোটে। পেয়েও আমরা সে রত্নকে পাইনি।

মরিয়ম বেগম বলেন—সত্যি আমার মনিরের মত কই কাউকে তো দেখিনি। ওগো আমি কেন এ শোক বইবার জন্য বেঁচে রইলাম। আমার হৃদয় যে চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছে। একটিবার ওকে দেখার জন্য মন যে আমার আকুলি বিকুলি করছে।

চৌধুরী সাহেব উঠে পায়চারী শুরু করলেন, হয়তো তাঁর চোখ দুটি ও ঝাপসা হয়ে আসছিল।

গোটা দিনটা মনিরার উদগ্রীবভাবে কাটলো। কতবার আনন্দে অধীর হয়েছে সে, কতবার চোখের পানিতে বুক ভাসলো। তার মনির আজ মুক্ত। তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই সে আসবে। মন বলছে সে আসবে।

কিন্তু সন্ধ্যা গিয়ে রাত এলো। ক্রমে রাত বেড়ে চললো। কই সে তো এলো না। তবে কি মনির আসবে না। হয়তো সে অভিমান করেছে, পিতার ওপর রাগ করেই সে আর এ বাড়িতে আসবে না।

দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মনিরা।

এমন সময় তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। চারদিক ঘন অন্ধকার। বনহুর সম্মুখস্থ জলের পাইপ বেয়ে দ্রুত উপরের দিকে এগিয়ে চললো।

শরীরে কালো ড্রেস, মুখে কালো রুমাল বাঁধা, মাথায় কালো পাগড়ী, পেছনে মুক্ত জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে ছিল সে।

চমকে মুখ তুলে মনিরা। বনহুরকে সে কোনদিন দস্যুর ড্রেসে দেখেনি। বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠে—কে তুমি?

বনহুর এগিয়ে এসে নিজের মুখের বাধা পাগড়ী পরে আচল খুলে সঙ্গে সঙ্গে মনিরা আনন্দধ্বনি করে ওঠে—মনির!

উহু মনির নই, দস্যু বনহুর।

না, আমার কাছে তুমি দস্যু নও। তুমি আমার মনির..মনিরা ছুটে গিয়ে বনহুরের কণ্ঠবেষ্টন করে ধরে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে, আবেগভরা গলায় ডাকে—মনিরা।

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ গুজে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—মনির তুমি আমার।

কিন্তু আমি যে দস্যু?

না না, আমি সে কথা মানব না। তুমি যে আমার সব।

বনহুর মনিরাসহ খাটে গিয়ে বসে। পাশাপাশি বসলো ওরা দু'জনে। মনিরার হাতের মুঠায় বনহুরের একখানা হাত। ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা তার মুখের দিকে। কালো ড্রেসে অপূর্ব সুন্দর লাগছে বনহুরকে। মনিরা তন্ময় হয়ে দেখছে। সে দেখার যেন শেষ নেই।

মনিরার বিস্ময়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে বনহুর। তারপর মনিরার চিবুক ধরে উঁচু করে বলে—মনিরা, তুমি কেন আমায় মায়ার বন্ধনে বেঁধে ফেলছ বল তো?

মনিরার গণ্ড বেরিয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। স্থির কণ্ঠে বলে সে—দস্যু বনহুরকে যদি মায়ার বন্ধনে বাঁধতে পারি, তবে সে হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব।

বনহুর ওকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়, তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে—মনিরা।

মনিরা নিজেকে বিলিয়ে দেয় বনহুরের বাহুবন্ধনে।

বানহুর শান্তকণ্ঠে বলে—মনিরা, তুমিই না একদিন বলেছিলে দস্যু বনহুর মানুষ নয়, সে মানুষ নামে কলঙ্ক। সে কথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

মনির, তুমিও সেদিন বলেছিলে মনে পড়ে—দস্যু বলে সে কি মানুষ নয়। তার মধ্যে কি মানুষের হৃদয় নেই—

মনিরা, আমি জানি দস্যু বলে সবাই আমাকে ঘৃণা করলেও তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারবে না।

তুমি জানো না, তোমার আব্বা-আম্মার মনেও আজ কি ব্যথা গুমরে কেঁদে মরছে। তুমি যে তাদের নয়নের মণি ছিলে, তোমাকে হারিয়ে তাঁদের প্রাণে যে কত আঘাত লেগেছিল, তা তুমি জানো না। আজও তাঁরা তোমার সে শিশুকালের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছেন। আজও তাঁরা ভুলতে পারেননি,তোমাকে। মামীমা প্রায়ই তোমার কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেন। মামুজানের প্রাণেও কম ব্যথা নেই। তারপর তোমাকে আবার অভাবনীয়ভাবে ফিরে পেয়ে তখনই নির্মমভাবে হারালেন। মনির, তাদের অবস্থা অবর্ণীয়।

বনহুরের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। ব্যথাভরা সুরে বলে—সব জানি মনিরা, সব বুঝি। কিন্তু আমি যে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি। মনিরা আমি বড়ই হতভাগ্য, তাই অমন দেবতুল্য পিতা-মাতা পেয়েও পাইনি।

মনির, আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।

তা হয় না মনিরা।

তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ করেছিলে আর দস্যুতা করবে না। এরি মধ্যে তুমি ভুলে গেলে সব?

না ভুলে যে কোন উপায় নেই, মনিরা। একটা উম্মত্ত নেশা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমি নিজের জন্য আর দস্যুতা করবো না। কিন্তু শয়তানের শাস্তি, কৃপণের ধন, অহংকারীর দর্প চূর্ণ আমি করবোই। মনিরা শপথ আমি রক্ষা করতে পারলাম না বলে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মনির।

না না, আমি দস্যু বনহুর। আমি দস্যু—এক লাফে বনহুর মুক্ত জানালা দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

স্তব্ধ মনিরা পাথরের মূর্তির মত থ'মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, তার কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো—মনির।

❑

মুরাদের পিতা অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে মুরাদকে জেল থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। কিন্তু মুরাদ মুক্ত হয়ে আবার দুর্দান্ত শয়তান হয়ে উঠলো। মনিরাই হলো তার একমাত্র লক্ষ্য। মনিরাকে তার চাই।

তার দলবল যারা একদিন হোটেল থেকে পালিয়েছিল আবার তারা ফিরে এসে যোগ দিল মুরাদের সঙ্গে। এবার তারা অন্য একটি গোপন স্থানে আস্তানা তৈরি করলো। শয়তান নাথুরাম হলো এই দলের নেতা।

সেদিন নাথুরামের আস্তানায় গোপন এক আলোচনা সভা বসেছিল। মুরাদ একটা উচ্চ আসনে বসেছিল। দলপতি নাথুরাম দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে আর অন্যান্য অনুচর কেউ বা দাড়িয়ে কেউ বা বসে আছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে মুরাদ—যত টাকা চাও তাই দেব তবু মনিরাকে আমার চাই।

নাথুরাম গোঁফে হাত বুলিয়ে বলে—হুজুর, নাথু থাকতে মনিরাকে পাবেন না, এটা কথা হলো না। আমি ওকে এনে দেবই।

মুরাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে শয়তানের হাসি—তুমিই পারবে নাথু, মনিরাকে তুমিই এনে দিতে পারবে।

হ্যাঁ হুজুর, আমার দলের কেউ কমজোর নয়, আপনাকে খুশি করতে আমরা কেউ পিছ পা হবো না।

ধন্যবাদ নাথুরাম। মুরাদ কথাটা বলে নাথুর পিঠ চাপড়ে দেয়। নাথুরামের ভয়ঙ্কর মুখে ফুটে ওঠে এক পৈশাচিক হাসি। নাথুর চেহারা দেখলে মানুষ এমনিতেই ভয় পায়। বলিষ্ঠ চেহারা। আকারে বেঁটে, মাথায় খাটো করে ছাঁটা চুল। চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মত ক্ষুদে কুতকতে। বড় বড় দাঁত বেরিয়ে আছে ঠোঁটের ওপরে। সেকি ভয়ঙ্কর চেহারা দলপতি নাথুরামের।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো নাথুরামের প্রধান অনুচর গহর আলী, নাথুরামকে লক্ষ্য করে সালাম করলো।

মুরাদ হেসে বলেন—এত দেরী হলো কেন গহর আলী।

বিরাট একটি ঝাঁকি দিয়ে হেসে উঠলো গহর আলী—সব খবর নিয়ে তবেই ফিরছি হুজুর। চৌধুরী সাহেবের বেটি মনিরা তার বান্ধবীদের নিয়ে আগামী পূর্ণিমার রাতে নৌকা বিহারে যাবে।

মুরাদের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে ওঠে, একটা আনন্দ সূচক শব্দ করে ওঠে সে—ঐ রাতের জন্য প্রস্তত থেক নাথুরাম, ঐ দিন আমি মনিরাকে চাই।

নাথুরাম হাতের মধ্যে হাত রগড়ায়—হুজুর, অগ্রিম কিছু টাকা...

হ্যাঁ, এই নাও—পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে ছুঁড়ে দেয় মুরাদ নাথুরামের হাতে—এতে পাঁচ হাজার আছে। মনিরাকে পেলে আরও দেব।

সালাম হুজুর, আপনার অনুগত চাকর আমরা। যা বলবেন তাই করবো।

বেশ, তাহলে আমার সব কথা স্মরণ রেখে কাজ করো। নাথুরাম, মনে রেখো সিংহের মুখের আহার কেড়ে নিচ্ছো তোমরা। দস্যু বনহুর ভালবাসে মনিরাকে।

নাথুরামের বিদঘুটে মুখে একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠলো। বলেন সে—দস্যু বনহুর তো দূরের কথা, ওর বাবা এসেও নাথুরামকে হটাতে পারবে না। নাথুরাম হাত দিয়ে দু'বাহুতে চপেটাঘাত করে।

সমস্ত দলবল হর্ষধ্বনি করে উঠলো— সর্দার নাথুরাম কি জয়। সর্দার নাথুরাম কি জয়।

মুরাদ এবং অন্য সকলে এবার একটা বিরাট গোলটেবিলের চারিদিকে গিয়ে বসে, তারপর চললো বোতলের পর বোতল।

মুরাদ জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে—নাথুরাম, তোমাদের নৌকা তো ঠিক আছে।

হ্যাঁ হুজুর, নৌকা ছিপনৌকা, বজরা সব ঠিক আছে। আমাদের নৌকাটাই যাতে ওরা ভাড়া করে সে চেষ্টা করবো। আপনি কিছু ভাববেন না হুজুর।

মুরাদ নাথুরামের পিঠ চাপড়ে দেয়—বহুৎ খোশ খবর। নাথু সত্যি তুমি কাজের লোক। কথার ফাঁকে হেউ হেউ করে ঢেকুর তোলে মুরাদ। তারপর সে —কিন্তু আমার নিকটে ওকে কখন পৌঁছাচ্ছ তাই বল?

সে চিন্তা করবেন না হুজুর! আগে সে দিনটা আসুক। আপনার টাকা আর আমাদের মনিরা—কিছু ভাববেন না হুজুর, কিছু ভাববেন না!

কিন্তু কি করে তোমরা তাকে আমার নিকটে পৌঁছাবে একটু শুনাও না, আমার যে বড্ড শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

নাথুরাম এপাশে ওপাশে একটু দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলে—আপনার বজরাখানা সে তিন মাইল দূরে যে বাকটা আছে সেখানে বাঁধা থাকবে।

আমরা মাঝি সেজে চৌধুরী কন্যা এবং তার বান্ধবীগণকে নিয়ে ঝিনাইদাতে নৌকা ভাসাবো । তারপর আমাদের ছিপ প্রস্তুত থাকবে, সে ছিপ নৌকার মনিরাকে নিয়ে একেবারে আপনার বজরায়...

চমৎকার বুদ্ধি এটেছো নাথুরাম একেবারে বিউটিফুল আইডিয়া—কিন্তু খুব সাবধানে, বুঝেছো?

হ্যাঁ হুজুর আর বলতে হবে না। চলো নাথুরাম।

❑

চৌধুরী সাহেব বসে বসে একটা পত্রিকা পড়ছিল। এমন সময় বৃদ্ধ সরকার ফয়েজ সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন। চৌধুরী সাহেব চশমার ফাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন—নৌকা ঠিক করেছেন সরকার সাহেব?

জ্বি হ্যাঁ, নৌকা ঠিক করে তবেই বাড়ি ফিরছি। নৌকা বেশ বড়সড় আর সুন্দর। ভাড়াটা একটু বেশি নেবে।

তা নিক, নৌকাটা তবে বেশ মন মতই পেয়েছেন? দেখুন ঝড় উঠলে কোন ভয়ের কারণে নেই তো?

না, তবে সবই খোদার হাত।

এমন সময় মনিরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলে—মামু জানের শুধু ঝড়ের ভয়।

হ্যাঁ মা, ঝড় আমার জীবনে এক চরম আঘাত দিয়ে গেছে। আচ্ছা মা মনিরা, কত বেড়ানোর জায়গা থাকতে তোমাদের কিনা নৌকা ভ্রমণের সখ চাপলো? আমার কিন্তু মন চায় না নৌকায় কোথাও যাওয়া।

একবার ভয় পেয়েছেন তাই আপনার মনে এ দুর্বলতা মামুজান। তাছাড়া আমি তো একা যাচ্ছিনে। আমরা অনেকগুলো মেয়ে যাব।

কিন্তু খুব সাবধানে থেক মা। খোদা না করুক কোন বিপদে না পড়ো।

মনিরা গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। মনে তার অফুরন্ত আনন্দ। সেদিন বনহুরের নিবিড় আলিঙ্গন তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমস্ত সত্তা যেন বিলীন হয়ে গেছে বনহুরের আলিঙ্গনের মধ্যে। আজও সে নিভৃতে বসে সেদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করে গভীর আনন্দ উপলব্দি করে। সেদিনের সে মুহূর্ত মনিরা জীবনে ভুলবে না। এত কাছে কোনদিন ওকে পায়নি সে যেমন করে সেদিন মনিরা তাকে পেয়েছিল।

মনিরা বিছানায় শুয়ে ডিমলাইটটা জ্বেলে দিল। হঠাৎ তার পাশের টেবিলে একটা তীরফলক এসে গেঁথে গেল, তীরফলকের সঙ্গে এক টুকরা কাগজ বাধা রয়েছে।

মনিরা তীরফলকটা হাতে তুলে কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। কাগজের টুকরায় লেখা রয়েছে, "মনিরা, আজ রাতে আসবো আমি—বনহুর।"

একদিন এই নাম শুনলে হৃৎকম্প শুরু হত মনিরার। মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠতো, আর আজ এই নাম কত মধুর কত আনন্দদায়ক খুশিতে আত্মহারা মনিরা কি করবে যেন ভেবে পায় না। বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানা নিয়ে বার বার দেখতে লাগলো সে। ফুলের মত শুভ্র একটি মুখ, মনিরা ছবিটা গালে-ঠোটে ঘষতে লাগলো।

ক্রমে রাত বেড়ে আসে। মনিরা উদগ্রীব হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে দস্যু বনহুরের। মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে বার-বার তাকায় অন্ধকারে। একসময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে মনিরা, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ। মনিরা ফিরে তাকিয়ে আনন্দ ধ্বনি করে উঠে—মনির এসেছো? ছুটে গিয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে—এসেছো। আজি ক'দিন থেকে তোমার জন্য ব্যাকুল চোখে পথ চেয়ে আছি।

কেন? কেন তুমি আমার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করো মনিরা?

কেন তোমার প্রতীক্ষা করি আজও তুমি জানো না?

নিষ্ঠুর!

তার চেয়েও বেশি। দস্যু কোনদিন দয়া-মায়া জানে না মনিরা।

না না, ও কথা বলো না মনির। তুমি যে আমার কাছে সবচেয়ে উদার মহৎ, স্নেহময়—বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদে মনিরা।

বনহুর বিছানায় গিয়ে বসে।

মনিরা ওর পাশে গিয়ে মাথার পাগড়ী খুলে নিয়ে পাশে টেবিলে রাখে, তারপর নিজেও বসে পড়ে পাশে।

বনহুর ওর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলে—মনিরা, তুমি না বলেছিলে দস্যু বনহুরের নামে হৃদকম্প হয় আমার। আর আজ—বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—আজ তোমার নাম স্মরণে হৃদয় আমার আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। সত্যি মনিরা, তোমার নামে এত মধু....

তাই নাকি?

হ্যাঁ আচ্ছা, মনির আজ তোমাকে একটা জিনিস দেব, বল নেবে?

তোমার দেয়া কোন জিনিসকেই যে আমি অবহেলা করতে পারি না মনিরা।

বনহুরের একখানা হাত তুলে নেয় মনিরা নিজের হাতে। তারপর নিজ আংগুল থেকে সে হীরার আংটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দেয় বনহুরের আংগুলে।

বনহুর বলে উঠে—একি করছো মনিরা?

হেসে বলেন মনিরা—একদিন তুমি এই হীরার আংটি হরণ করতে এসেই আমার হৃদয় চুরি করে নিয়েছ। আজ সে আংটি গ্রহণ করে তোমার হৃদয় আমাকে দান কর।

উহুঁ, দস্যু বনহুর হৃদয় দান করতে জানে না সে জানে গ্রহণ করতে। আংটি তুমি খুলে নাও মনিরা।

না।

সেদিন যা নেই নি, আজ তা আমি নিতে পারবো না।

মনির, আমার দান তুমি গ্রহণ করতে পারবে না।

আমি অক্ষম মনিরা।

দস্যু বনহুর জীবনে কোনদিন......

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—দয়ার দান গ্রহণ করে না, এই তো?

হ্যাঁ, সে কথা মিথ্যে নয়।

মনির—এ আমার দয়ার দান? প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এসব কিছুই নেই এর মধ্যে? মনিরার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোঁটা অশ্রু।

মনিরার চোখের পানি দস্যু বনহুরকে বিচলিত করে তোলে।

প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মনিরার চোখের পানি মুছিয়ে দেয়।

মনিরা ওর হাতের উপরে হাত রাখে। অপরিসীম এক আনন্দ তার মনে দোলা দিয়ে যায়। ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় মনিরা দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে বলে—মনিরা, বেশ আমি এটা গ্রহণ করলাম।

বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠে—মনির!

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে বলে—মনিরা।

মনিরা এবার বনহুরের আংটিসহ হাতখানা নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বলে—মনির, সত্যি তুমি অপূর্ব।

উভয়ের নীরবে কেটে চলে কিছুক্ষণ। মনিরা বলে ওঠে একসময়—জানো মনির, পরশু বিকেলে আমরা ঝিনাইদা নদীতে নৌকা ভ্রমণে যাচ্ছি? সঙ্গে থাকবে আমার কয়েকজন বান্ধবী। সত্যি মনির তুমি যদি আমাদের সংগে থাকতে, ইস কত আনন্দ পেতাম।

কিন্তু তোমার সখীরা কি খুশি হত? যদি জানতো দস্যু বনহুর তাদের নৌকায় রয়েছে।

তারা তোমার আসল রূপ জানে না, তাই তোমার নামে তাদের এত আতঙ্ক। সত্যি মনির, একবার তারা যদি তোমায়.....

এমন সময় দরজায় মামীমার কণ্ঠ শুনা গেল—মনিরা দরজা খোল দরজা খোল। ঘরে কার সাথে কথা বলছিস?

মনিরা চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে—মামীমা টের পেয়েছেন।

বনহুর ঠোটে আংগুল চাপা দিয়ে বলে—চুপ। তারপর উঠে দাঁড়ায় সে। মনিরার হাতের মুঠা থেকে বনহুরের হাতখানা খসে আসে মৃদুস্বরে বলে—চললাম।

তারপর অন্ধকার জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় দস্যু বনহুর।

মনিরা জানালা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসে দরজা খুলে দেয়।

মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে ব্যস্তকণ্ঠে বলেন—মনি, এ ঘরে কার কথা শুনলাম?

মনিরা চোখ রগড়ে বললো—কই আমি তো এই মাত্র দরজা খুলে দিলাম।

মরিয়ম বেগম বলেন—আমি যে স্পষ্ট শুনলাম, কেউ যেন কথা বলছে?

মনিরা হেসে বলে—তুমি স্বপ্ন দেখছো মামীমা। আমার ঘরে কে আবার কথা বলবে? দুশ্চিন্তায় তোমার মনের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। চলো মামীমা, শোবে চলো।

কি জানি আমি তো জেগেই ছিলাম। হয়তো মনের ভুল সত্যি মা, মনি আমাকে পাগল করে দিয়ে গেছে। কথাগুলো বলতে বলতে বেরিয়ে যান মরিয়ম বেগম।

মনিরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। দরজা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেয় সে।

❑

মাথার নিচে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বনহুর। পাশে বসে নূরী ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ বনহুরের আংগুলে দৃষ্টি চলে যায় তার। আনন্দধ্বনি করে ওঠে নূরী—হুর, ও আংটি তুমি কোথায় পেলে?

হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলেন বনহুর—উঁহু ওটা আংটি নয়।

তবে কী?

ওটা প্রীতির দান।

প্রীতির দান। কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে?

নূরী, সব জানতে চেয়ো না।

আমাকে বলতে তোমার এত আপত্তি কেন হুর। বল ও আংটি তুমি কোথায় পেলে?

হেসে বলে বনহুর—রাগ করবে না তো?

রাগ। মোটেই না! বল তুমি ঐ আংটি কার নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছ?

কেড়ে নেইনি পরিয়ে দিয়েছে।

মিথ্যা কথা, দস্যু বনহুরের আংগুলে কেউ আংটি পরিয়ে দেবে এত বড় সাহস কার আছে। সত্যি করে বল এ আংটি কোথায় পেলে?

একটি মেয়ে আমাকে উপহার দিয়েছে।

ঠাট্টা কর না হুর।

ঠাট্টা নয় নূরী। উঠে বসলো বনহুর। আংগুলের আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

নূরীর মুখমণ্ডল পরিবর্তন দেখা দেয়। গম্ভীর গলায় বলে—হুর কে সে রানী যে তোমার আংগুলো আংটি পরিয়ে দিতে পারে?

বনহুর উঠে দাঁড়ায়—সব কথা বলা যায় না নূরী।

নূরী আর কোন প্রশ্ন করে না। ধীরে ধীরে উঠে নিজের কক্ষের দিকে চলে যায়। অভিমানে ভরে ওঠে তার মন...একথা কি সত্য? বনহুরকে অন্য কোন নারী আংটি পরিয়ে দিতে পারে? না না, সে সবই সইতে পারে কিন্তু

বনহুরকে অন্য কোন মেয়ে ভালবাসবে, এ সহ্য করতে পারবে না। বনহুর যে তার, ওকে ছাড়া নূরী কাউকে বুঝে না। সে জীবনে এ একটিমাত্র পুরুষকেই চিনে এসেছে। সে হচ্ছে তার জীবনের একমাত্র সাথী। আর ভাবতে পারে না নূরী। বনহুর মিথ্যে কথা বলেছে না-না কোন নারী দস্যু বনহুরকে ভালবাসতে পারে না। সবাই তার নামে আঁতকে ওঠে। হৃদকম্প শুরু হয় তাদের কিন্তু বনহুরকে যদি একবার কোন নারী স্বচক্ষে দেখে সে কিছুতেই ভালো না বেসে পারবে না। ওর মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ আছে যার কাছে সবাই পরাজিত হবে। সত্য কি তবে ওকে কোন নারী....না না, তা হতে পারে না। বনহুর তার। তাকে কোন নারী তার কাঝ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না...ছুটে যায় নূরী বনহুরের কক্ষে।

বনহুর নতুন একড্রেসে সজ্জিত হচ্ছিল। নূরী ছুটে গিয়ে চেপে ধরে ওর জামার আস্তিন—বনহুর ঠিক করে বল, তুমি যা বললে তা সত্যি?

হেসে ওঠে বনহুর—এরই মধ্যে এত ঘাবড়ে গেলে নূরী?

না না, আমাকে তুমি সত্যি করে বল? হুর, আমি সব সইতে পারি কিন্তু তোমাকে হারাতে পারি না... বাস্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর কণ্ঠ ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে অশ্রুধারা।

বনহুর আংগুল দিয়ে নূরীর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে —অযথা মন খারাপ কর না নূরী।

বনহুর, বল তুমি যা বললে, সব মিথ্যে?

নূরী, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারিও না? আমার কাছে তোমার কোন অমর্যাদা হবে না।

বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে নূরী—হুর, তুমি আমার!

বনহুর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন হয়তো তার মনে আর একটি মুখ ভেসে উঠেছে।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বলে—যাও নূরী, বল তাজকে প্রস্তুত করতে।

নূরী বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে আসে—তাজ তৈরি আছে হুর।

বনহুর নূরীর রক্তিম গণ্ডে আংগুল দিয়ে মৃদু আঘাত করে হেসে বলে—চললাম নূরী!

নূরী শুধু ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

টানা বারান্দা বেয়ে এগিয়ে যায় বনহুর। তারপর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বিকট আকার ব্যাঘ্র মূর্তির মুখগহ্বরে পা দিয়ে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে আসে তার সম্মুখে। বনহুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই দু'জন লোক তাজকে এনে হাজির করে বনহুর একলাফে চড়ে বসে তাজের পিঠে। তাজ উল্‌কাবেগে ছুটতে শুরু করে।

বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়ে বনহুর। তারপর তাজের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—বাড়ি ফিরে যা তাজ।

এবার বনহুর কিছুটা এগিয়ে যায়।

ওপাশে রাস্তার উপরে একটি মোটরকার অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার বনহুরকে দেখতে পেয়েই গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

বনহুর ড্রাইভ আসনে উঠে বসতেই ড্রাইভার তার পাশে বসে। বনহুর এবার গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

অতি দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিল বনহুর। চোখে আজ তার এক নতুন উম্মাদনা।

ঘাটের অদূরে পাশাপাশি কয়েকখানা ছোট বড় নৌকা বাঁধা রয়েছে। ওদিকের একখানা বড় নৌকা বেশ পরিপাটি করে সাজানো, কয়েকজন মাঝি। বৈঠা হাতে বসে রয়েছে। একজন বলিষ্ঠ মাঝি দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মাথায় পাগড়ী দিয়ে তার মুখের খানিকটা অংশ ঢাকা। চোখেমুখে একটা শয়তানী ভাব উপচে পড়ছে। কিন্তু লোকটা পাগড়ী দিয়ে নিজের মুখটাকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছে, যাতে কেউ তার মুখ সহজে দেখতে না পায়। অন্যান্য মাঝির মাথাতেও এক একটা গামছা বাঁধা। কারও বা মাথায় একখণ্ড কাপড় জড়ানো, যেমন মাঝিদের হয়।

এই নৌকাখানাই মনিরাদের জন্য ভাড়া করা হয়েছে, দাঁড়ীর বেশে যে লোকটা পাগড়ীর আড়ালে মুখটা লুকাতে চেষ্টা করছে, তবে সে ব্যক্তি অন্য কেউ নয়—শয়তান নাথুরাম এবং অন্যান্য মাঝির বেশে তারাই অনুচরবর্গ।

অল্পক্ষণেই একদল বান্ধবীসহ মনিরার গাড়ি এসে দাঁড়ালো ঘাটের অদূরে। গাড়ি রেখে নেমে ছিল সবাই। চৌধুরী সাহেব এবং সরকার সাহেব উভয়ে এসেছেন তাদের সঙ্গে। সরকার সাহেব আংগুল দিয়ে বড়

নৌকাখানা দেখিয়ে দিয়ে বলেন—চৌধুরী সাহেব, ঐ নৌকাখানা আমি মা মণিদের জন্য ভাড়া করেছি।

চৌধুরী সাহেব নৌকা দেখে খুশি হলেন হেসে বলেন—বেশ, বেশ সুন্দর নৌকাখানা তো! বেশ বড়সড়ও সরকার সাহেব। আপনি কিন্তু ওদের সঙ্গেই থাকবেন।

জি হ্যাঁ আমি মা-মনিদের সঙ্গেই যাচ্ছি। কথাটা বলেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মনিরা হাত উঠিয়ে ডাকে—এই মাঝি নৌকা নিয়ে এসো।

মাঝিগণ ব্যস্ত হয়ে নৌকা এগিয়ে আনতে লাগলো। নৌকাখানা খুব বড় হওয়ার একেবারে ঘাটের নিকটে পৌছল না, মাঝিরা একটা তক্তা ঘাট আর নৌকায় পেতে দিল।

মেয়েদের আনন্দ আর ধরে না । সবাই এক এক করে তক্তা খানার ওপর দিয়ে নৌকায় গিয়ে পৌঁছল। মনিরা কিন্তু খুব ভয় হচ্ছিল সে বারবার তক্তাখানায় পা রেখে পা সরিয়ে নেয়। চৌধুরী সাহেব এবং বৃদ্ধ সরকার সাহেব মনিরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেমন করে মনিরা নৌকায় যাবে? অন্যান্য মেয়েরা নৌকায় পৌঁছে হাসাহাসি শুরু করলো। মনিরার অবস্থা দেখে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগলো। কেউ বলেন—মনিরা এত ভীতু। কেউ বলেন—আয় আমার হাত ধরে পার হয়ে আয় মনি। কেউ বলেন—মাঝিদের একজন পার করে নাও না।

মনিরা নিরুপায় হয়ে তাকাচ্ছে মামাজানের মুখের দিকে।

চৌধুরী সাহেব বলে উঠেন, ও মাঝি, ওকে হাত ধরে পার করে নাও, দেখ পড়ে না যায়।

একজন মাঝি এগিয়ে আসতেই অন্য একজন মাঝি তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই এগিয়ে এসে মনিরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মনিরা সঙ্কুচিতভাবে হাতখানা এগিয়ে দিল ওর দিকে। মাঝি মনিরার হাত চেপে ধরে নিবিঘ্নে পার করে নিল। কিন্তু মনিরা নিজের হাতে কেমন যেন একটা মৃদু চাপ অনুভব করলো। মনে মনে ভীষণ রাগ হলো মনিরার। মাঝির হাত থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে নৌকায় একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

মেয়েরা মুখ টিপে হাসলো। একজন মনিরার কাছে মুখ নিয়ে বলেন, মাঝিটার তোর জন্য বড় দরদ।

যা, যত সব ইয়ে!

সরকার সাহেব নৌকায় উঠে বসতেই নৌকা ছেড়ে দিল মাঝিরা।

চৌধুরী সাহেব ঘাট থেকে হাত তুলে বলেন, বেশি রাত করো না মনিরা।

মনিরাও হাত নেড়ে বলল, বেশি রাত করবো না মামুজান, তুমি বাড়ি যাও।

নৌকায় বসে মেয়েদের সোক আনন্দ। কেউ বা গান গাইতে শুরু করলো, কেউ বা হাসি আর গল্পে মেতে রইল। কেউ বা মাঝিদের হাত থেকে বৈঠা নিয়ে পানি টানতে শুরু করলো।

মনিরা কিন্তু গম্ভীর হয়ে রয়েছে। কারণ মাঝিটার আচরণ এখনও তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কি অসভ্য ঐ মাঝিটা, একটা ছোটলোকের বাচ্চা। কেউ যে ওর হাতে হাত রাখে তাই ভাগ্য। সে কিনা তার হাতে চাপ দিল! ছিঃ বড় লজ্জার কথা, মনিরা সকলের অলক্ষ্যে একবার মাঝিটার দিকে বিষনজরে তাকায়, মাঝিটা যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই মনিরা রাগে অধর দংশন করলো এবং তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

হাসলো মাঝিটা। দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দের সঙ্গে তার মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে মিলিয়ে গেল শুনা গেল না কিছু।

সাথীরা ধরে ফেললো তাকে একটা গান শুনাতে হবে। মনিরা কিছুতেই গাইবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে গাইতেই হলো।

বান্ধবীদের জেদে তার কোন আপত্তিই টিকলো না। মনিরার গানের সুর আর দাঁড়ের ঝুপঝাপ শব্দ মিলে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, ঢেউয়ের বুকে দোল খেয়ে যেন এগিয়ে চলেছে।

গোটা নৌকায় বিরাজ করছে এক অপরিসীম আনন্দ। বৃদ্ধ সরকার সাহেবও মেয়েদের সঙ্গে আনন্দে মাতোয়ারা। মনিরার গানের সুরের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছেন তিনি।

হাসি গল্প আর আনন্দের মধ্যে নৌকাখানা যে অনেক দূরে এসে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই কারো।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র। সমস্ত ঝিনাইদা নদীটা যেন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু আলোর বন্যা।

মনিরা বলে ওঠে—সরকার চাচা এবার নৌকা ফেরাতে বলুন। সরকার সাহেবও বলে উঠলেন—তাইতো, অনেক দূরে এসে পড়েছি আমরা। মাঝি এবার তোমার নৌকা ফেরাও।

মাঝিরা হঠাৎ কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে ছিল। নৌকাখানা যেমন চলছিল তেমনি এগুতে লাগলো বরং গতি আরও বেড়ে গেছে। মনিরা বলে ওঠে, মাঝি নৌকা ফেরাও।

কিন্তু কই তারা যেমন দাঁড় টানছিল, তেমনি নির্বিকারভাবে কাজ করে চলেছে। নৌকা ফেরাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অদূরে দেখা গেল ঝিনাইদার বাঁক। সবাই লক্ষ্য করলো বাঁকের মুখে একখানা বজরা বাঁধা রয়েছে। বজরায় কোন আলো নেই।

জ্যোস্নার আলোতে বজরাখানাকে একটি ভাসমান কুটিরের মত মনে হলো।

এমন সময় নৌকার পেছনে শুনা গেল চাপা একটি কণ্ঠস্বর সব মনে আছে তো?

অপর একটি চাপাকণ্ঠ—আছে হুজুর।

পূর্বের কণ্ঠ মেয়েটিকে ঠিকভাবে চিনে রেখেছিস?

হ্যাঁ, হুজর....

দাঁড়ের শব্দে কথার আওয়াজগুলো মেয়েদের বা সরকার সাহেবের কানে যায় না।

হঠাৎ দেখা যায় বজরার দিক থেকে একখানা ছিপনৌকা তর তর করে এদিকে এগিয়ে আসছে।

মাঝিদের ভাবসাব লক্ষ্য করে মেয়েরা আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ সরকার সাহেব বারবার বলতে থাকে মাঝি, নৌকা ফেরাও মাঝি নৌকা ফেরাও—

কিন্তু মাঝিরা সে কথা কানেও নেয় না।

মেয়েরা ভয়ার্তস্বরে এটা সো বলাবলি শুরু করলো। কেউ বা কেঁদেই ফেললো।

সরকার বলেন—মাঝি, তোমরা জানো না এ নৌকায় কার ভাগ্নী আছে? শিগগির নৌকা ফেরাও।

ঠিক সে মুহূর্তে দাঁড়ী-মাঝি সরকার সাহেবের বুকের কাছে রিভলভার চেপে ধরে গর্জে ওঠে—জানি এবং তার জন্যই আমরা নৌকা বেয়ে এতদূর এসেছি। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে সবাই চুপ করে থাক। চৌধুরী সাহেবের ভাগ্নী মনিরাকে আমাদের চাই।

ভীষণভাবে শিউরে উঠলো মনিরা। এবার সে বুঝতে পারলো মাঝিদের মনোভাব। কিন্তু মুখে ভয়ের ভাব না এনে বলেন—খুবতো আস্পর্ধা তোমাদের দেখছি। মনিরাকে নেওয়া যত সহজ মনে করছে তত সহজ নয়। শিগগির নৌকা ফেরাও, নচেৎ আমরা সবাই মিলে চিৎকার করবো!

শয়তান নাথুরাম হেসে ওঠে—হাঃ হাঃ হাঃ চিৎকার করবে? এই নির্জন নদীবক্ষে কে শুনবে তোমাদের কণ্ঠস্বর?

অন্য মেয়েরা সবাই পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। কারও মুখে কথা নেই। মনে-প্রাণে সবাই খোদাকে স্মরণ করতে থাকে। ভয়ে সকলের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

সরকার সাহেব বৃদ্ধ, তবু হার মানলেন না, চিৎকার করে বলেন—শয়তান, তোমাদের চক্রান্ত আগে বুঝতে পারলে তোমাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দিতাম।

হুঙ্কার ছাড়ে নাথুরাম—তা যখন পারনি তখন বুড়ো বয়সে পৈতৃিক জানটা নষ্ট কর না। সুবোধ বালকের মত নিশ্চুপ বসে থাক।

নিরস্ত্র সরকার সাহেব শুধু চিৎকার করে শাসাতে লাগলেন, তাছাড়া আর কিইবা করবেন তিনি! এতগুলো দস্যুর সঙ্গে পেরে ওঠা তার পক্ষে মুশকিল।

মেয়েদের মধ্যে একটা হুলস্থুল শুরু হয়েছে। কেউ কাঁদছে, কেউ-বা চিৎকার করছে। কেউ বা বলছে—এটা দস্যু বনহুরের নৌকা। সে মনিরাকে চুরি করার জন্য এই ফন্দি এটেছে।

মেয়েরা তো বনহুরের নামে কাঁপতে শুরু করলো! সেকি ভীষণ অবস্থা।

ছিপ নৌকাখানা একেবারে নিকটে পৌঁছে গেছে।

দু'জন বলিষ্ঠ লোক মনিরাকে জাপটে ধরলো। বাধা দিতে গেল সরকার সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে একটা বলিষ্ঠ লোক তার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিল। সরকার সাহেব ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল নৌকায়।

লোক দু'জন মনিরাকে শূন্যে উঠিয়ে নিল, তারপর লাফিয়ে ছিল ছিপ নৌকাখানায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মাঝিগণও ছিপ নৌকায় লাফিয়ে পড়তে লাগলো।

ওদিকে মনিরার বান্ধবীগণ ভীষণ আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। বাঁচাও! বাঁচাও! দস্যু বনহুর আমাদের সর্বনাশ করলো, আমাদের মেরে ফেললো। বাঁচাও বাঁচাও....

মনিরাকে ছিপ নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো দস্যুগণ বজরাখানার দিকে। মনিরাও তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করছে—বাঁচাও বাঁচাও...

মাঝি-বেশি শয়তানের অনুচরের দল ছিপ্ নৌকায় দাঁড় টেনে চলেছে। ওদিকে মনিরার বান্ধবীও আহত সরকার সাহেবকে নিয়ে বড় নৌকাখানা আপন মনে এদিকে ভেসে চললো।

ছিপ নৌকাখানা প্রায় বজরার নিকটবর্তী হয়েছে, এমন সময় সে মাঝি যে মনিরাকে তক্তা পার করে নিতে গিয়ে তার হাতে মৃদু চাপ দিয়েছিল, সে হাতের বৈঠা নিয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। অন্য মাঝিদের ছিপ নৌকাখানা ভীষণ একটা ঘুরপাক খেয়ে গেল।

আচমকা এই বিপদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না শয়তান নাথুরাম, সে রিভলভার উদ্যত করে গর্জে উঠলো কে তুই?

মনিরা জ্যোস্নার আলোতে লক্ষ্য করলো, এ সে মাঝি কিছু পূর্বেও যে মাঝিকে সে মনে মনে অভিসম্পাত করছিল। এক্ষণে মনিরার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, কে এ মাঝি যার প্রাণে এত দয়া? নিশ্চয়ই তাকে বাঁচানোর জন্যেই মাঝিটির এত প্রচেষ্টা।

নাথুরাম মাঝিটার বক্ষ লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে ধরতেই মাঝিটা চট করে সরে দাঁড়ালো, নাথুরামের রিভলভার নিস্তব্ধ নদীবক্ষে গর্জে উঠলো—গুড়ুম।

মাঝিটা নাথুরামকে পুনরায় রিভলভার উদ্যত করতে না দিয়ে ভীষণভবে আক্রমণ করলো। নাথুরাম টাল সামলাতে না পেরে ছিপ

নৌকাখানার মধ্যে পড়ে গেল। মাঝি তার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল নদীবক্ষে।

ততক্ষণে অন্য শয়তানগুলো আক্রমণ করে মাঝিটাকে। চলে ভীষণ ধস্তাধস্তি।

ছোট্ট ছিপ নৌকাখানার উপরে সেকি তুমুল অবস্থা। ভয়ে মনিরার অবস্থা মরিয়া হয়ে উঠলো। এভাবে নৌকা ভ্রমণের জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলো!

সামান্য একটি ছিপ নৌকা এভাবে কতক্ষণ টিকতে পারে। বিশাল নদীবক্ষে ছিপ নৌকাখানা মোচার খোলার মত দুলতে লাগলো। মনিরা ভয়কম্পিত বক্ষে দেখছে এই বুঝি ছিপ নৌকাখানা ডুবে যায়। মনে প্রাণে সে মাঝিটার কামনা করছে। কি আশ্চর্য ওর সঙ্গে এতগুলো শয়তান পেরে উঠছে না। মাঝিটা এক একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে নাথুরামের অনুচরগণকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিন্তু নাথুরাম হটার বান্দা নয়, সে প্রাণপণে মাঝিটাকে কাবু করার চেষ্টা করতে লাগলো।

হঠাৎ ছিপ নৌকাখানা একপাশে কাৎ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল নদীবক্ষে।

কোথায় গেল মনিরা কোথায় বা নাথুরাম আর শয়তান মাঝিদের দল। যে যেদিকে পারলো সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলো।

মনিরা তলিয়ে যাচ্ছে। সে সাঁতার কাটতে পারে না। বাঁচার কোন উপায় নেই তার। ঢক ঢক করে কিছুটা পানি খেয়ে ফেললো সে। এই ছিল তার অদৃষ্টে। হায় কেন সে আজ নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। মৃত্যকালে একবার মনে ছিল মনিরের কথা। আর ওর মুখখানা দেখতে পেল না মনিরা। তবু বাঁচার জন্য মনিরা হাত-পা ছুঁড়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

হঠাৎ মনিরা অনুভব করলো কেউ যেন তাকে ধরে ফেলেছে। মনিরা তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। একটা একটা খড়-কুটোও তখন তার কাছে অতি বড় সম্পদ। সে কিছু না ভেবে আঁকড়ে ধরলো শত্রু কিংবা মিত্র ভাবার সময় তখন তার নেই।

মনিরা যখন চোখ মেলে তাকালো তখন একটা উজ্জল আলো তার সামনে ছড়িয়ে ছিল। উঠে বসতে গেল অমনি একটা বলিষ্ঠ বাহু তাকে শুইয়ে দিল।

মনিরা চমকে ফিরে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আপ্লুত কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—মনির।

হাসলো বনহুর, কোন জবাব দিল না।

মনিরা আনন্দের আবেগে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে—তুমি! এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। মনির, কি করে আমি তোমার পাশে এলাম। বল, বল মনির?

হেসে বলেন বনহুর—সে মাঝি তোমাকে আমার নিকটে পৌঁছে দিয়েছে, যে নাবিককে তুমি মনে মনে অভিসম্পাত করেছিলে।

মনিরার চোখে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে, অবাক হয়ে বলে—মনির তুমি কি করে জানলে আমি সে মাঝিকে গালমন্দ দিয়েছিলাম সে মাঝিই বলেছে।

মনিরা আরও অবাক হয়ে বলে—সে কি করে আমার মনের কথা বলবে? জান মনির, সত্যি আমি তাকে অসভ্য বলে মনে মনে গালমন্দ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে না হলে হায় কি যে হত। শয়তান দস্যু দল আমাকে হত্যা করতো।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর—হত্যা করতো না একথা সত্য তোমাকে তারা হরণ করে এক শয়তানের হাতে সমর্পণ করতো-----

উঃ কি সর্বনেশে কথা! মনির, সে মাঝি তোমার কে?

কি তার পরিচয়?

সে আমার বন্ধু।

বন্ধু? মনির আমার হয়ে তুমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। বেচারা আমাকে কত কষ্ট করে বাঁচিয়েছে!

নাহলে তুমি এখন শয়তান মুরাদের হাতে গিয়ে...

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা—মুরাদ!

হ্যাঁ, সে মুরাদ তোমাকে হস্তগত করার জন্য অবিরত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, হাজার হাজার টাকা সে পানির মত খরচ করেছে।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে মনিরা—পাষণ্ড শয়তান....মনির, তোমার মাঝি বন্ধু কত মহৎ।

হ্যাঁ মনিরা, গরীব বলে কখনও কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়, বা অবহেলা করা ঠিক নয়। তাই বলে সবাইকে বিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

মনিরা বনহুরের জামার বোতাম নিয়ে নড়াচড়া করতে করতে বলে—আমি কি জানতাম ওটা ডাকাতের নৌকা। ভাগ্যিস মাঝিটা ছিল, সত্যি তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এক্ষণি তাকে যদি পেতাম...

কি করতে?

হাত ধরে মাফ চেয়ে নিতাম।

বনহুর মনিরার হাতের কাছে হাতখানা বাড়িয়ে দেয়—সে মাঝি তোমার সামনে উপস্থিত মনিরা নাও মাফ চেয়ে নাও।

মনিরার চোখে বিস্ময়, মুখে ফুটে ওঠে স্মিত হাসির রেখা, বলে ওঠে সে—তাই বল। হ্যাঁ, এবার বুঝেছি সব। তাই তো বলি, কোন সে মাঝি যার এত বীরত্ব।

কই মাফ চেয়ে নিলে না আমার কাছে।

মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রেখে চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে বলে—তুমিই এবার আমার নিকটে মাফ চেয়ে নাও। কারণ, একটি যুবতীর হাতে চাপ দেওয়া কম দোষণীয় নয়।

বনহুর আর মনিরা মিলে হাসতে থাকে। বনহুর বলেন—মনিরা, এখানে বেশিক্ষণ থাকা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। বল এবার তোমাকে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়?

মনিরা চারদিকে তাকিয়ে বলে—এখন আমি কোথায় মনির?

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলে—তুমি এখন আমার গুপ্তকক্ষে বন্দী রয়েছ।

কি বললে এটা তোমার গুপ্তকক্ষ?

হ্যাঁ, গভীর মাটির তলায় রয়েছ এখন তুমি।

এ তুমি কি বলছ!

কেন, ভয় হচ্ছে নাকি?

না।

জান মনিরা, এখানে যদি তোমাকে চিরদিন আটকে রাখি কেউ তোমার সন্ধান পাবে না। এখানে শুধু তুমি আর আমি। মনির, তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করতে পারবো।

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

মনিরা বলে—কি ভাবছো!

জবাব দেয় বনহুর—ভাবছি, তোমার মামাজান-মামীমার কথা। তারা এতক্ষণে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন।

কি বললে, আমার মামুজান আর মামীমা? তোমার কেউ নন তাঁরা? বলেন, আব্বা আর আম্মা।

সত্য মনিরা, আব্বা আর আম্মা খুব বুঝি ভাবছেন তোমার জন্য। একদিন ঐ ঝিনাইদার বুকে হারিয়েছিল তাঁর প্রিয় পুত্র মনিরকে। আর আজ সে ঝিনাইদা হরণ করলো তাদের একমাত্র কন্যা সমতুল্যা ভাগ্নী মনিরাকে না না, আর বিলম্ব করা উচিৎ হবে না মনিরা, চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

মনিরাও উঠতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বসে ছিল সে।

বনহুর পুনরায় পাশে বসে বলল—এখনও অসুস্থ বোধ করছো মনিরা?

হ্যাঁ, মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে।

তবে চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাক। আমি এক্ষুণি আসছি।

কোথায় যাবে মনির?

বিশেষ একটা দরকার আছে।

যাও! মনিরা, বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই মনিরা উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো সব। যে কক্ষে সে শুয়েছিল সেটা একটা মাঝারি রকমের ঘর। কক্ষের দেয়াল কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি। কোন আড়ম্বর নেই সে কক্ষে। মেঝের এক পাশে পাথর দিয়ে তৈরি একটা খাট। খাটে দুগ্ধ ফেননিভ কোমল বিছানা, যে বিছানায় সে এতক্ষণ শুয়েছিল। মনিরা বুঝতে পারল ঐ বিছানা দস্যু বনহুরের। কক্ষের একপাশে একটা পাথরের টেবিল। টেবিলে ছোটবড় কয়েকখানা রিভলবার। ওপাশের দেয়ালে ঠেস দেওয়া

রয়েছে বড় বড় ভারী গোছের দুটো রাইফেল। আর একটা টেবিলে কতকগুলো সুতীক্ষ্ণধার ছোরা, অবশ্য সেগুলো সব খাপের মধ্যে আটকানো। মনিরা ধীরে ধীরে সে অস্ত্রগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল। এগুলো বনহুরের ব্যবহার্য অস্ত্র। সবগুলোতে যেন তার হাতের স্পর্শ লেগে রয়েছে।

মনিরা এগুতে লাগলো, দেখতে পেল সামনে একটি দরজা তার ওপাশেই একটা সিঁড়ির মত আরও নিচে নেমে গেছে। মনিরা এক পা দু'পা করে এগুতে লাগলো। সিঁড়ির মুখে গিয়ে অবাক হলো সে, নিচে ঠিক তার পায়ের তলায় একটা হলঘরের মত প্রকাণ্ড একটা ঘর। ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। মনিরা অবাক হয়ে দেখলো বনহুর একটি উচ্চ আসনে বসে আছে। তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো বলিষ্ঠ লোক, প্রত্যেকের হাতেই এক একটা রাইফেল। মাথায় পাগড়ী কানে বালা, হাতে বালা, গায়ে ফতুয়ার মত আটসাট জামা।

মনিরা স্তব্ধ হয়ে দেখছে লোকগুলো বনহুরের কোন আদেশের প্রতীক্ষা করছে।

কি যেন বলেন বনহুর স্পষ্ট বুঝা গেল না, ভীষণকায় লোকগুলো কুর্নিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর সারিবদ্ধভাবে অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকগুলোর চেহারা দেখে মনিরার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গিয়েছিল। ঠিক যেন একদল রাক্ষসের মধ্যে বনহুর একটি দেবমূর্তি। আশ্চর্য হলো মনিরা, এত ভয়ঙ্কর লোকগুলো বনহুরকে সিংহের মত ভয় করে।

মনিরা এই কথা ভাবছে হঠাৎ শুনতে পেল সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ।

সম্বিৎ ফিরে এলো মনিরার, সে দ্রুত নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে ছিল।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে মনিরার পাশে গিয়ে বসলো। মনিরা নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে এই সে দস্যু বনহুর যার ভয়ে গোটা দেশ প্রকম্পমান। যার নাম স্মরণ করে সবাই আতঙ্কে শিউরে ওঠে। পুলিশমহল যাকে গ্রেপ্তারের জন্য লাখ টাকা ঘোষণা করেছে সেই দস্যু বনহুর তার পাশে। তার অতি প্রিয়জন।

বনহুর হেসে বলল—অমন করে কি দেখছো মনিরা?

তোমার আসল রূপ।

কেমন দেখছো?

অনেক সুন্দর—মনির, সত্যি তুমি আমাকে ভালবাস?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মনিরা?

বল— আমার মন শুনতে চাচ্ছে।

বাসি। মনিরা... অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে মনিরা।

চলো মনিরা, এবার তোমাকে রেখে আসি।

যদি না যাই তোমার খুব অসুবিধা হবে, না।

আমার নয়, তোমার হবে।

কেন? কি করে আমার অসুবিধা হবে?

মনিরা, তুমি শিশু নও। তোমার নিরুদ্দেশ লোকনিন্দার কারণ হবে। আব্বা আম্মা তোমার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। বল তো তখন তাঁদের কত কষ্ট হবে?

মনিরা উঠে দাঁড়ায়, তারপর বনহুরের হাত ধরে বলে— চলো।

চলতে চলতে কথা হয় দুজনের মধ্যে। মনিরা বলে—তুমি না আমার গা ছুঁয়ে শপথ করেছিলে আর দস্যুতা করবে না। পারলাম না আমার কথা রাখতে মনিরা। শয়তান নাথুরাম ভয়ঙ্কর শয়তানী শুরু করেছে।

নাথুরাম—সে আবার কে?

মাঝির ছদ্মবেশে যে তোমাকে হরণ করতে যাচ্ছিলো।

শয়তান নাথুরাম!

হ্যাঁ, সে শুধু শয়তান নয় মনিরা, সে নরপিশাচ। দেখে নিতে চাই শয়তান নাথুরামের কত বাহাদুরি! আজই খবর পেলাম জম্বুরা পর্বতের এক গুহায় তার গোপন আস্তানা রয়েছে। সেখানে নাথুরামের একটি কালি মন্দিরও আছে। মন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় একটি কুমারী কন্যাকে বলি দেওয়া হয়।

মনিরা আর্তনাদ করে ওঠে—উঃ কি ভীষণ কাণ্ড!

শুধু তাই নয় মনিরা, সে আরও অনেক কিছু দুষ্কর্মের সঙ্গে লিপ্ত আছে। আমি ওকে দেখে নেব।

বনহুরের মনোভাব আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল না মনিরা। কিন্তু অনুভব করলো সে মনিরার হাতের মধ্যে বনহুরের বলিষ্ঠ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তারপর কিছুদূর নীরবে এগুলো তারা।

এবার এক সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলো মনিরা আর বনহুর । বেশ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। বনহুর মনিরাকে এঁটে ধরলো—মনিরা, সাবধানে আমার হাত ধরে চলবে। পা ফসকে গেলেই মৃত্যু।

মনিরা বনহুরের হাত এটে ধরে চলতে লাগলো।

চলতে চলতে হেসে বলল বনহুর—মাঝি বেচারা তোমার হাতে মৃদু চাপ দিয়েছিল বলে সে তোমার অসংখ্য অভিসম্পাত কুড়িয়েছে, আর এখন...

যাও ঠাট্টা রাখ। মনিরা বনহুরের হাতে হাত রেখে পায়ের দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুরকে জাপটে ধরলো সে। সুড়ঙ্গ পথের আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল, সরু একটা পথ, তার নিচেই হাত দেড়েক দূরে গভীর খাদ। শিউরে উঠলো মনিরা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল—আমি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না মনির, আমাকে তুমি নিয়ে চলো।

বনহুর হেসে বলেন—বেশ, তুমি চোখ বন্ধ করো, ওয়ান, টু, থ্রী—বনহুর মনিরাকে ছোট বালিকার মত দু'হাতের উপর উঠিয়ে নিল। এবার দ্রুত চলতে লাগলো সে। মনিরা দুহাতে নিজের চোখ ঢেকে চুপ করে রইলো।

সুড়ঙ্গের বাইরে এসে মনিরাকে নামিয়ে দিয়ে বলল বনহুর, চোখ যেন খুলে না, পড়ে যাবে।

মনিরা বুঝতে পারলো, এখন সে বেশ প্রশস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মেলে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো—ইস, কি সুন্দর আলো-বাতাস।

একটা মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর আর মনিরা। একি, দিন যে। তবে যে ওখানে অত আলো জ্বলছিল! বুঝতে পারলো মনিরা ওটা মটির নিচে তাই আলোর ব্যবস্থা।

মনিরা সামনে তাকাতে দেখতে পেল অদূরে একটি জমকালো অস্ত্র নিয়ে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর লোক দুটিকে ইংগিত করতেই অশ্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। বনহুর এবার মনিরাকে অশ্বে উঠিয়ে নিয়ে নিজেও চড়ে বসলো। হেসে বল—এর নাম কি জান?

না।

এর নাম তাজ।

বহুদিন নিশীথ রাতে অশ্বখুরধ্বনি কর্ণগোচর হয়েছে। আজ স্বচক্ষে দেখলাম এবং তার পৃষ্ঠে আরোহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। সত্যি আজ আমি গর্বিত।

তাজ এবার উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো। বনহুর মনিরাকে বাঁ হাতে এঁটে ধরে দক্ষিণ হাতে লাগাম চেপে ধরলো।

তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। তারপর মনিরাকে নামিয়ে বলেন—এবার কিছুটা হাঁটতে হবে, পারবে?

পারবো।

কিন্তু আমি আর যাচ্ছিনে তোমার সঙ্গে ঐ যে গাড়িখানা পথের ওপরে দেখছো ওটা আমার গাড়ি। ড্রাইভার তোমাকে বাড়িতে পৌছে দেবে!

মনিরা।

বল?

আবার কখন তোমার দেখা পাব?

যখন তোমার মন আমাকে ডাকবে, দেখবে ঠিক আমি তোমার পাশে পৌছে গেছি। আচ্ছা এবার যাও, আল্লাহ্ হাফেজ।

মনিরা এগুতে লাগলো, আর বারবার ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো বনহুর তাজের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মনিরা গাড়িখানায় পাশে পৌঁছতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। মনিরা আর একবার ঘুরে বনহুর আর তাজের দিকে ফিরে তাকিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলো।

গাড়ি বারান্দায় পৌছতেই মনিরা নেমে ছুটে গেল অন্দর বাড়িতে। দেখতে পেল তার সমস্ত বান্ধবী, যারা নৌকায় ছিল সবাই চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমকে গত রাতের ঘটনাটা বুঝাতে চেষ্টা করেছে। বৃদ্ধ

সরকার সাহেবের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। সকলের মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন।

চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমের চোখে অশ্রু, তাঁরা অবিরত কাঁদছেন।

মনিরাকে দেখতে পেয়েই বান্ধবীরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো। চৌধুরী সাহেব চোখের পানি মুছে এগিয়ে আসেন—কোথায় গিয়েছিলে মা, কি করে ফিরে এলি? ডাকাতরা নাকি তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

মেয়েরা একসঙ্গে বলে ওঠে—দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ নয়। তারই ঐ কাজ, কিন্তু কি করে ফিরে এলি ভাই?

চৌধুরী সাহেব বলেন—একটু সুস্থ হউক, সব শুনছি।

মনিরাকে পেয়ে মরিয়ম বেগম আনন্দে অধীর হলেন। তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—ভাল ছিলে তো, মা?

হ্যাঁ মামীমা। ভাগ্যিস এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকাতের নৌকা থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তাই রক্ষা। খুব ভদ্র মহৎ ব্যক্তি তিনি। খোদার অপরিসীম দয়ায় আর তাঁর কৃপায় এ যাত্রা পরিত্রাণ পেয়েছি।

সব শুনে আশ্বস্ত হলেন চৌধুরী সাহেব। বান্ধবীরা মনিরাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো। মরিয়ম বেগম বলেন—তোমরা বসো, আমি চা-নাস্তার আয়োজন করি।

চৌধুরী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন—কাল থেকে কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম, যাই পুলিশ অফিসে খবরটা জানিয়ে আসি। মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে হয়রান পেরেশান হচ্ছেন। তারপর সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন—চলুন, ওদিক হয়ে ডাক্তারখানায় যাব। আপনার আরও একটি ইনজেকশন লাগবে!

সরকার সাহেবও উঠে দাঁড়ান—চলুন।

সবাই বেরিয়ে যান। বান্ধবীরা একজন বলে—ভদ্রলোক কেমন দেখতে রে মনিরা?

হেসে বলে মনিরা —খুব সুন্দর। অপূর্ব!

অন্য একটি মেয়ে বলে—বয়স খুব বেশি?

না, খুব কম। তবে তিরিশের কাছাকাছি।

আর একজন বান্ধবী টিপ্পনি কাটে—খুব বড়লোক বুঝি?

মনিরা স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেয় রাজাধিরাজ?

প্রথম বান্ধবী চাপাকণ্ঠে বলে— সে কি বিবাহিত?

না।

একসঙ্গে সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে—মারহাবা! আমাদের নৌকাভ্রমণ সার্থক হয়েছে তাহলে!

একজন বলেন—মনিরার ভাগ্য বলতে হবে।

অন্যজন বলে—শুধু ভাগ্য নয়—সৌভাগ্য।

আর একজন বলে— ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন।

হ্যাঁ, পারে।

আমাদের হিংসে হচ্ছে কিন্তু।

আচ্ছা তোমাদের ভাগ দেব কিছুটা করে।

তখন আর দেখাবিনে, লুকিয়ে রাখবি সবার কাছ থেকে।

না, তোদের দেখাব কথা দিলাম।

এমন সময় মরিয়ম বেগম চা-নাস্তা ট্রে-সহ কক্ষে প্রবেশ করেন।

মনিরা উঠে গিয়ে মামীমার হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে নিজেই তৈরি করতে বসে।

❑

সে দিন বনহুর মাধুরীর ঘরে রাত কাটিয়ে গেছে কথাটা যখন সবাই জানতে পারলো তখন মাধুরীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভোরে যখন অদ্ভুতভাবে জামাইবাবু স্বয়ং এসে উপস্থিত হল তখন তো আরও ঘোরতর ব্যাপার। জামাই বাবু রাতের ঘটনা সব বর্ণনা করে শুনাল কিন্তু নিজের স্ত্রীর কক্ষে দস্যু বনহুর রাত্রিবাস করছিল এ যে যার-পর-নাই কেলেঙ্কারি কথা! অমন স্ত্রীকে জামাই নিমাই বাবু গ্রহণ করতে অসম্মত হলো।

মাধুরী অনেক করে বলেন—স্বামীর পা ছুঁয়ে শপথ করলো, দস্যু হলেও সে অতি মহৎ জন মাধুরীকে সে স্পর্শ করেনি। কিন্তু মাধুরীর কথাটা জামাই নিমাই বাবু বিশ্বাস করলো না।

শ্বশুর শাশুড়ীর কান্নাকাটি, স্ত্রী মাধুরীর চোখের জল নিমাইকে ধরে রাখতে পারলো না। সে রাগ করে চলে গেল।

মাধুরীর জীবনে নেমে এলো এক চরম পরিণতি। চোখের পানি হলো তার সম্বল। একি হলো তার বিয়ের পর স্বামীকে না চিনতেই তাকে হারাল মাধুরী। যত রাগ গিয়ে ছিল দস্যু বনহুরের ওপর, কিন্তু তার তো কোন অপরাধ নেই, দুস্য হলেও মাধুরী তার হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছে সে অতি মহান-অতি মহৎ। স্বর্গের দেবতার চেয়েও সে পবিত্র!

মাধুরী নিজের অজ্ঞাতে বনহুরের স্মৃতিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে। তার সৌম্যসুন্দর মূর্তি হৃদয় আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে সে। শত চেষ্টাতেও মাধুরী ভুলতে পারছে না দস্যু বনহুরের কথা। মানুষ কত হৃদয়বান হলে তবেই তার স্বভাব এমন দেবসমতুল্যা হতে পারে, সদাসর্বদা তাই ভাবে মাধুরী। মনের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে তার স্মৃতিকে। ঐ একটি রাতের পরিচয় মাধুরীর জীবনে এনে দেয় বিরাট একটা পরিবর্তন। বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখখানা মাধুরী কিছুতেই ভুলতে পারলো না।

মাধুরী ছিল মনিরার সহপাঠিনী। এককালে মনিরার সঙ্গে একই কলেজে পড়তো। মাধুরী ছিল হিন্দু, মনিরা মুসলমান, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ছিল গভীর একটা যোগাযোগ। মনিরা মাধুরীকে খুব ভালবাসত। হঠাৎ মাধুরীর বাবা দূরে শহরের অপর প্রান্তে একটি বাড়ি করে সেখানে চলে যান। সে জন্য ছাড়াছাড়ি হয় উভয়ের মধ্যে।

সেদিন মনিরা শহরের ঐ দিকে কোন প্রয়োজনবশতঃ গিয়েছিল হঠাৎ তার মনে পড়ে মাধুরীর কথা, একবার দেখা করে গেলে মন্দ হয় না। মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেছে খবরটা মাধুরীর একটা চিঠিতেই জানতে পেরেছিল। বাড়ির ঠিকানাটাও মাধুরী পাঠিয়েছিল তাকে।

মাধুরীর বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশি বিলম্ব হয় না মনিরার! গাড়ি রেখে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে ডাকে—মাধুরী—মাধুরী!

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, মাধুরী ঘরে শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিল, শুনতে পেরে ছুটে আসে। জড়িয়ে ধরে উভয়ে উভয়কে। মনিরা মাধুরীর সাদাসিধে পোশাক দেখে হেসে বলে— কিরে মাধুরী বিয়ে করলি, কিন্তু এমন কেন?

মনিরার কথায় মাধুরীর মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন হয়ে ওঠে, কি যেন ভাবে। তারপর বলে—মনি, ঘরে চল্ সব বলছি।

মনিরাকে সঙ্গে করে নিয়ে বসায় মাধুরী।

মনিরা হেসে বলে—এরই মধ্যে যে একেবারে বুড়ী বনে গেছিস মাধু, ব্যাপার কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে মাধুরী—ভাই, বিয়ে হয়েছে সত্য, কিন্তু ও বিয়ে আমার বিয়ে নয়!

তার মানে?

মানে, স্বামী বলে কিছু জানি না।

হেঁয়ালি রেখে সোজা কথা বল।

তবে শুন্ আমার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে, যদি ধৈর্য ধরে শুনিস তবে বলি।

বল আমি শুনতে চাই। মনিরা ভালো হয়ে বসলো।

মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলে—হঠাৎ আমার বাবা মামীমার নিকট থেকে একদিন একটা চিঠি পেলেন। তাতে লিখেছেন, আপনার কন্যা মাধুরীর জন্য একটি সুপাত্র পেয়েছি, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আসতে পার, তবে বিয়ে হবে কারণ পাত্রের মা ছেলের বিয়ে দিয়েই চলে যাব তীর্থে।

এ দিকে ঠিক সে সময় আমার দিদিমার ভীষণ অসুখ। জানিস তো দিদিমাই ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন। দিদিমার অসুখের জন্য এ বিয়েতে কেউ মত দিল না, কিন্তু বাবার ইচ্ছা তিনি এখানেই আমাকে সঁপে দেব। এত ভালো ছেলে নাকি আর পাওয়া যাবে না। কাজেই বাবা শুধু আমাকে নিয়ে রামনগর চললেন।! মা কিংবা আমাদের বাড়ির কেউ যেতে পারলেন না। দিদিমার অবস্থা খারাপ কখন কি হয়।

তারপর সেখানে পৌঁছে দুদিন কেটে গেল বিয়ের আয়োজন করতে। বাবা আমাকে নিয়ে মাসীমার ওখানেই উঠেছিল। তিনদিন পর বিয়ে হলো, কিন্তু বাসর শয্যার পূর্বেই একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির-দিদিমার মৃতপ্রায় অবস্থা, যদি দেখার ইচ্ছে থাকে চলে এসো। বিয়ে তো হয়েই গেছে কাজেই বাবা চলে আসতে চাইলেন। আমিও কেঁদেকেটে আকুল হলাম দিদিমাকে একটিবার শেষ দেখা দেখবো।

স্বামী রাগ করলেন তবু আমি বাবার সঙ্গে চলে এলাম। তারপর দিদিমা চলে গেল, শ্রাদ্ধ হলো, বাবা অনেক করে আমার স্বামীকে লিখলেন, কিন্তু

তিনি এলেন না। রাগ তার পড়েনি। তারপর পনেরো দিন যেতে না যেতেই স্বামীর চিঠি পেলাম, আমি অমুক দিন রাতের ট্রেনে তোমাকে নিতে আসছি।

চিঠি পেয়ে বাবা মা এবং আমিও অত্যন্ত খুশি হলাম। যাক রাগ তাহলে পড়েছে।

যেদিন উনি আসবেন ঐদিন আমার আনন্দ আর ধরে না। আমাদের পুরোন ভৃত্যটিকে পাঠালাম ষ্টেশনে ওকে এগিয়ে আনতে।

আসলেন উনি, রাত তখন তিনটে হবে। বাবা-মা তাকে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রহণ করলেন।

তারপর স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম রাত্রি।

মনিরা অবাক হয়ে শুনছে, ভাবছে এ আবার বলার মত কি! তবু হেসে বলেন—খুব খুশি লাগছিল বুঝি তোর?

হ্যাঁ সে, দিনের আনন্দ আমি কোনদিন ভুলব না মনিরা। স্বামী ঘরে এল, সে আমি প্রথম তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম। বিয়ের দিন লজ্জায় তাকে এমন করে দেখতে পারিনি। আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমার স্বামী এত সুন্দর! ভুলে গেলাম লজ্জা শরম স্বামীকে সাদর-সম্ভাষণ জানালাম। কিন্তু কি আশ্চর্য সে তাতে এতটুকু সাড়া দিল না।

সেকি।

হ্যাঁ, শুধু নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো।

তারপর? সে জানালো আমি বড় অসুস্থ ঘুমাবো! আমি তার ঘুমে বাধা দিলাম না। কখন যে রাত ভোর হয়ে গেছে চেয়ে দেখি পাশে সে নেই। তারপর যখন তার আসল পরিচয় পেলাম জানতে পারলাম সে আমার স্বামী নয়।

স্তব্ধকণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা—কি বল, সে তোর স্বামী নয়!

না।

তারপর?

আর তার দেখা পাইনি। ভোর হলো, আমার স্বামী স্বয়ং এসে পৌঁছলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন অন্য এক পুরুষ আমার কক্ষে রাত কাটিয়ে গেছে, তখন তিনি আর কিছুতেই আমাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। আমি তার পা ছুয়ে শপথ করেছি, সে আমাকে স্পর্শ করে নি, তবু—

এসব কি বলছিস মাধু! সব আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।

হ্যাঁ, সব আশ্চর্য। আজ তোকে ছুঁয়েও আমি শপথ করলাম।

এবার বুঝেছি তোর স্বামী তোকে অবিশ্বাস করেছেন।

হ্যাঁ।

এ তার ভারী অন্যায়। জেনে যদি কোন ভুল হয়, তার কি ক্ষমা নেই? আচ্ছা আজ উঠি ভাই।

মাধুরী বলে ওঠে গল্প করতে করতে সময় কাটলো। চা, খাবি নে?

আজ নয়, আর একদিন আসব।

❑

ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করতে করতে বলে মুরাদ নাথুরাম, তোমার মত বীর পুরুষকে যে কাবু করতে পারে সে কে হতে পারে।

নাথুরাম মাথা চুলকায়—হুজুর, আমি তাকে কোনদিন না দেখলেও বুঝতে পেরেছি সে দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ নয়।

তোমাদের এতগুলো লোককে দস্যু বনহুর পরাজিত করে চলে গেল অথচ তোমরা কিছু করতে পারলে না?

আমরা এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। দস্যু বনহুর কখন যে আমাদের একজন মাঝিকে সরিয়ে তারই ছদ্মবেশে আমাদের নৌকায় উঠে পড়েছিল, আমরা কেউ এতটুকু টের পাইনি।

ওকেই তো বলে বাহাদুরের বাহাদুরি। এবার বল মেয়েটা কোথায় গেল? ডুবে মরেনি তো?

না হুজুর, দস্যু বনহুর তাকে মরতে দেয়নি। সে সুস্থ শরীরে মামা মামীর পাশে ফিরে এসেছে।

কথাটা কানে যেতেই মুরাদের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো। আনন্দসূচক শব্দ ওঠে মুরাদ—মনিরা বেঁচে আছে।

হ্যাঁ হুজুর, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেমন করে হউক তাকে আপনার হাতে পৌঁছে দেবই। নইলে আমার নাম নাথুরাম সিং নয়। কিন্তু হুজুর আরও কিছু—হাতে হাত কচলায় নাথুরাম।

মুরাদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে—পাবে, আরও পাবে। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পনের হাজার যা চাও তাই দেব, তবু ওকে চাই।

আচ্ছা হুজুর।

আর একটি কথা, তোমরা জেনে রাখ নাথু, যতদিন দস্যু বনহুরকে তোমরা নিঃশেষ করতে না পেরেছো, ততদিন তোমাদের কোন বাহাদুরি নেই। তাছাড়া তোমরা নিশ্চিন্ত নও। আমিও নই। কারণ, আমি জানি দস্যু বনহুর ভালবাসে মনিরাকে এবং সে কারণেই ওকে হত্যা করতে হবে। যতদিন দস্যু বনহুর জীবিত থাকবে ততদিন আমি মনিরাকে একান্তভাবে পাব না।

ঠিক বলেছেন, বনহুরকে হত্যা না করতে পারলে আমাদের কিছুই করা সম্ভব নয়। হুজুর আজ আর বিলম্ব করতে পারি না। এক্ষুণি আমরা আস্তানায় রওনা দেব, অনুচরগণ সেখানে অপেক্ষা করছে।

নতুন কোন খবর পেয়েছ বুঝি?

হ্যাঁ হুজুর, মনসাপুরের জমিদার কন্যা সুভাষিণী আজ পালকী যোগে দোল পূর্ণিমায় মেলা হতে মনসাপুরে ফিরছে। মেয়েটি অতি সুন্দরী।

মুরাদের চোখ দুটো ক্ষুধিত শার্দুলের মত জ্বলে ওঠে—তাই নাকি।

হ্যাঁ হুজুর।

তাহলে তো আর একটি নতুন শিকারের সন্ধান পেয়েছ। সাবাস নাথুরাম! সত্যি তুমি কাজের লোক।

❑

পুলিশ অফিস।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন পেছনে হাত রেখে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়েছিল। অদূরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। সকলের মুখেই গভীর চিন্তার ছাপ।

দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার পর পুলিশ মহলে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার পুলিশ পরিবেষ্টিত এ হাঙ্গেরী কারাগার। এ কারাগার থেকে কোন দস্যু আজ পর্যন্ত পালাতে পারেনি। পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা, লৌহ ইস্পাতে গড়া এই হাঙ্গেরী কারাগার। ছোটখাটো চোর ডাকুর জন্য এ কারাগার নয়। যে ডাকাত বা দস্যু অত্যন্ত দুর্দান্ত তাদের জন্যই এ কারাগার। শেষ পর্যন্ত সে কারাগার থেকেও পালাল দস্যু বনহুর। পুলিশমহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সুপার পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। এতকাল তিনি বহু দস্যু দেখে এসেছেন, কিন্তু দস্যু বনহুরের মত দস্যু তিনি দেখেন নি। কারাগারের ভেন্টিলেটরের শিক বাঁকিয়ে পালানো কম কথা নয়— এ যে অদ্ভুত কাণ্ড।

পুলিশ মহল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছে। শহরে বন্দরে, পথেঘাটে সকলের মুখেই এক কথা দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার হতে পালিয়েছে।

ইন্‌সপেকটার হারুন বলে ওঠেন, দেখুন আপনারা এ দস্যু বনহুরকে যাই মনে করুন, সে ভদ্রঘরের সন্তান। মিঃ চৌধুরীর মত মহৎ ব্যক্তির সন্তান সে, কিন্তু পরিবেশ তাকে এতখানি জঘন্য করে তুলেছে।

পুলিশ অফিসার মিঃ হোসেন বলেন একথা সত্য, শুনেছি দস্যু বনহুর নাকি অপূর্ব সুন্দর দেখতে।

জবাব দেন মিঃ হারুন্ শুধু অপূর্ব সুন্দর নয় মিঃ হোসেন, অপূর্ব সুন্দর এমন চেহারার লোক এমন হতে পারে কল্পনার অতীত।

আর একজন অফিসার বলেন, দস্যু হবে দস্যুর মত ভয়ঙ্কর, কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে সুন্দর। আমি শুনেছি দস্যু বনহুরের ব্যবহারও নাকি অত্যন্ত ভদ্র।

সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ মিঃ কাওসার, তার ব্যবহার যদি দেখতেন কিছুতেই আপনি তাকে দস্যু বলে মেনে নিতে পারতেন না। কথাটা বলে আসন গ্রহণ করেন মিঃ হারুন। তারপর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন—হাজার সুন্দর হউক, হাজার ভদ্র হউক, তবু সে দস্যু—ডাকাত। আইনের চোখে সে অপরাধী।

শুধু অপরাধী নয়, সে পলাতক আসামী। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসান। তারপর বলেন—মিঃ রাও, কি করা যায় বলুন তো? সমস্ত শহরে-বন্দরে সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করেছি। যাকে সন্দেহ হবে তাকেই এরেস্ট করে হাজতে ভরবে।

শঙ্কর রাও হেসে বলেন—শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুরকে ধরতে গিয়ে কত যে ভদ্রলোক হাজতে বাস করবে, তার ঠিক নেই।

অগত্যা এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছি মিঃ রাও। আপনার মত অভিজ্ঞ ডিটেকটিভও দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সক্ষম হলো না। কিন্তু মিঃ রাও, আবার আপনাকে নতুন করে বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য অবতীর্ণ হতে হবে।

ইয়েস, আমি এ ব্যাপারে সব সময় প্রস্তুত আছি।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও। আপনাকে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

এমন সময় একজন পুলিশ সাব-ইন্‌সপেকটার একখানা টেলিগ্রাম এনে মিঃ হারুনের হাতে দেয়—স্যার টেলিগ্রাম।

মিঃ হারুন টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে পড়ে দেখলেন। তারপর বলেন—আগামীকাল কমিশনার সাহেব স্বয়ং হাঙ্গেরী কারাগার দর্শনে আসছেন।

বলে ওঠেন মিঃ কাওসার, এবার তাহলে পুলিশ মহলকে নাচিয়ে ছাড়বে।

মিঃ নাসের বলে ওঠেন—দস্যু বনহুর শেষ পর্যন্ত কমিশনার সাহেবকেও ঘাবড়ে তুললো।

মিঃ খালেক এতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে শুনছিল। তিনি বলেন, হাঙ্গেরী কারাগার থেকে দস্যু পালানো সরকার বাহাদুরের চরম অপমানের কথা।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর সবাই বিভিন্ন কাজে উঠে পড়েন, সমস্ত থানায় এবং পুলিশ অফিসে ফোন করে কথাটা জানিয়ে দিল। কারণ সবারই প্রস্তুত থাকতে হবে, তিনি যেন তাদের দোষ-ত্রুটি ধরতে না পারেন।

❑

মনসাপুরের পথ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে। পাল্‌কী বেহারাগণ দ্রুত পা চালিয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠের হুম্ হুম্ শব্দে নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠেছে। আজকাল দিন সময় ভালো নয়, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি প্রায়ই লেগে আছে। পাল্‌কীটির সঙ্গে কয়েকজন বন্দুকধারী পাহারাদার চলেছে। পাল্‌কীটিতে রয়েছে মনসাপুরের জমিদার কন্যা, সঙ্গে একজন দাসীও আছে।

নির্জন পথ।

এতদ্রুত পা চালিয়েও পাল্‌কী বেহারাগণ সন্ধ্যার পূর্বে মনসাপুরে পৌঁছতে সক্ষম হলো না। পথিমধ্যেই নেমে এলো গভীর অন্ধকার। সুভাষিণী চিন্তিত কণ্ঠে বেহারাগণকে জিজ্ঞেস করলো—আর কত পথ আছে বেহারা?

একজন বেহারা বলে ওঠে—এখনও আরও দুক্রোশ যেতে হবে দিদিমণি?

তোমরা একটু জোরে পা চালাও। আমার কেমন ভয় লাগছে! একজন পাহারাদার বলে ওঠে—কুছ ভয় নেহি দিদিমণি। হাম লোক আপকো সাথ হায়।

আর কিছুক্ষণ চলার পর পথটা একটা বনের পাশ দিয়ে চলেছে, সে পথ দিয়ে এগিয়ে চলল তারা। কিন্তু বেশি দূর এগুতে সক্ষম হলো না। হঠাৎ একদল মুখোশপরা লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলো। মার মার কাট কাট শব্দে স্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠলো।

বেহারাগণ ভয়ে পাল্‌কী ছেড়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাল।

বন্দুকধারী পাহারাদারগণ প্রাণপণ চেষ্টায় দস্যুদলের সঙ্গে লড়তে লাগলো, কিন্তু চারজন পাহারাদার কতক্ষণ টিকতে পারে! দস্যুদল তিনজন পাহারাদারকে হত্যা করে ফেললো। একজন বন বাদাড় ভেঙে ছুটতে লাগলো মনসাপুর অভিমুখে।

এ দস্যুদল অন্য কেই নয়, শয়তান নাথুরামের দল। এবার নাথুরাম পাল্‌কীর পাশে এসে দাঁড়ালো। ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে সুভাষিণীর মুখমণ্ডল। বৃদ্ধা দাসী হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে।

নাথুরাম পা দিয়ে বৃদ্ধাকে সরিয়ে সুভাষিণীর হাত চেপে ধরলো। একটানে বের করে আনলো তাকে। মশালের আলোতে সুভাষিণীর দেহের অলঙ্কার ঝকমক করে উঠলো।

নাথুরাম বিকট শব্দে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ একেবারে স্বর্গজয়। একগাদা অলঙ্কারের সঙ্গে অপ্‌সরী লাভ! হাঃ হাঃ হাঃ নাথুরামের হাসির শব্দে রাতের অন্ধকার খান খান হয়ে ভেঙ্গে ছিল। একজন অনুচরকে লক্ষ্য করে বলেন সে—খাদু সিং একে কাঁধে উঠিয়ে নাও।

খাদু সিং তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে যেমনি সুভাষিণীকে ধরতে গেল, অমনি বৃদ্ধা দাসী সুভাষিণীকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো— না না, একে দেব না, একে নিতে দেব না।

বৃদ্ধাকে টেনে ফেলে দেয় খাদু সিং। কিন্তু বৃদ্ধা তাতে ক্ষান্ত হয় না, সুভাষিণীকে হারিয়ে মনিবের নিকটে কি জবাব দিবে সে, পুনরায় উঠে জড়িয়ে ধরে সুভাষিণীর দেহটা—কিছুতেই আমি সুভাষিণীকে নিতে দেব না....।

এবার নাথুরাম বৃদ্ধাকে জোরপূর্বক ছাড়িয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর বর্শার এক আঘাতে গেঁথে ফেলে ওকে।

বৃদ্ধার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে পুনরায় আদেশ করে—এবার ওকে ওঠাও।

কিন্তু সুভাষিণীও কম মেয়ে নয়। সে খাদুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করলো। কিছুতেই সে বশ্যতা স্বীকার করবে না।

হঠাৎ এমন সময় একটা খট খট্ শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। নাথুরাম উবু হয়ে মাটিতে কান লাগিয়ে শুনতে লাগলো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—খাদু, রংলাল, জগাই। তাড়াতাড়ি কর, মনে হচ্ছে কেউ ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছে। তাড়াতাড়ি যুবতীকে কাঁধে উঠিয়ে নাও।

সুভাষিণীকে এবার তিন-চার জন ধরলো। সুভাষিণী কিল-চড় লাথি দিয়ে বাধা দিতে লাগলো, কিন্তু সে নারী; কতক্ষণ নিজেকে রক্ষা করতে পারে। হাঁপিয়ে পড়েছে।

জগাই জোর করে এবার সুভাষিণীকে কাঁধে উঠিয়ে নিল।

ঠিক সে মুহূর্তে একটা কালো অশ্ব ছুটে আসছে বলে মনে হলো তাদের। ওরা কতক পালাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার পূর্বেই অশ্বারোহী এসে ছিল সেখানে। মাত্র কয়েক মিনিট, অশ্বটা দু'পা উঠিয়ে নিজেকে সংযত করে নিল। অশ্বারোহী ততক্ষণে অশ্ব থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। মাথায় কালো পাগড়ী মুখে কালো রুমাল বাঁধা। শরীরে কালো ড্রেস, এক একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে এক একজন শয়তানকে ধরশায়ী করে চললো সে।

জগাই তাড়াতাড়ি সুভাষিণীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে ছোরা বের করলো। খাদুও বর্শা উঁচিয়ে আক্রমণ করলো অশ্বারোহীকে।

অশ্বারোহী সকলকে বীরত্বের সঙ্গে পরাজিত করে চললো।

নাথুরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য লক্ষ্য করছিল, এবার সে অশ্বারোহীর বুক লক্ষ্য করে রিভলভার উচুঁ করে গুলি ছোড়ে। অশ্বারোহী মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়। নাথুরামের গুলি গিয়ে বিদ্ধ হয় অদূরস্থ বৃক্ষে। এবার অশ্বারোহী নাথুরামকে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ না দিয়ে আক্রমণ করে। অল্পক্ষণেই নাথুরামকে পরাজিত করে তার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেয় অশ্বারোহী।

নাথুরামকে পরাজিত হতে দেখে তার দলবল কে কোনদিকে পালালো ঠিক নেই। নিরস্ত্র নাথুরাম এবার উঠে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। অশ্বারোহী এগিয়ে এসে সুভাষিণীর সামনে দাঁড়ালো।

সুভাষিণী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছিল আর থর থর করে কাঁপছিল। না জানি এ আবার কোন্ দস্যু? অশ্বারোহী এগিয়ে আসতেই সুভাষিণী ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলেন—কে আপনি, আমাকে এভাবে রক্ষা করলেন।

অশ্বারোহী বলেন—আমি যেই হই, আপনার মঙ্গলাকাংখী। ঠিক সময় পৌছতে পেরেছিলাম বলে আপনাকে বাঁচাতে সক্ষম হলাম। আসুন এবার আপনাকে বাড়ি পৌছে দি।

সুভাষিণী। অন্ধকারে নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকালো অশ্বারোহীর মুখের দিকে। এ আবার কোন শয়তানি করবে না তো? বিশ্বাস কি? এই নির্জন স্তব্ধ বনভূমিতে সে একা যুবতী মেয়ে। অজ্ঞাত এক পুরুষের সঙ্গে কোথায় যাবে। তবু তার ড্রেস স্বাভাবিক নয়, মুখেই বা কালো রুমাল বাঁধা কেন, সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলো সুভাষিণী। এই বিপদ মুহূর্তে একমাত্র বৃদ্ধা দাসী তার সম্বল ছিল, তাকেও হত্যা করেছে শয়তান ডাকাতের দল। সুভাষিণীর চোখ দিয়ে জল পর্যন্ত বের হচ্ছে না, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে।

অশ্বারোহী হেসে বলল—ভয় পাবার কিছু নেই আমি মানুষ। তবু সুভাষিণী তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবছে, মানুষ সবাই, কিন্তু তাদের কত বিচিত্র রূপ।

অশ্বারোহী এবার বুঝতে পারলো সুভাষিণীর মনোভাব। সে তার সঙ্গে যেতে নারাজ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে তার মুখে।

নাথুরামের অনুচরগণের হাতে ছিল জ্বলন্ত মশাল। পালাবার সময় তারা হাতের মশালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। অশ্বারোহী উবু হয়ে একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় সুভাষিণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তারপর নিজের মুখের রুমালটা এক টানে খুলে মশালটা উঁচু করে ধরলো।

যুবক জানে তার চেহারায় এমন একটা আকর্ষণীয় বস্তু আছে যার কাছে সবাই নতি স্বীকার করতে বাধ্য।

মশালের উজ্জল্ আলোতে সুভাষিণী অশ্বারোহীকে দেখলো, কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিল না সে। একি কোন্ দেবকুমার। এত সুন্দর সুপুরুষ সে তো কোনদিন দেখেনি।

এবার বিশ্বাস হচ্ছে। হেসে বলেন অশ্বারোহী।

সুভাষিণী ধীরে শান্তকণ্ঠে বলেন—চলুন।

আসুন, ঘোড়ায় উঠতে হবে। অশ্বারোহী এগিয়ে চলে তার অশ্বের দিকে।

সুভাষিণী তাকে অনুসরণ করে।

অশ্বের পাশে এসে দাঁড়ালো উভয়ে। অশ্বারোহীর হস্তে তখনও জ্বলন্ত মশাল। সুভাষিণী নির্বাক আখি মেলে তখনও তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

অশ্বারোহী বলেন—আসুন, আপনাকে উঠিয়ে দি।

অশ্বারোহী সুভাষিণীকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও চড়ে বসে। সুভাষিণীর মনে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কে এই যুবক? কি এর পরিচয়? স্বর্গের দেবতা ছাড়া এত সুন্দর মানুষ হয়? সুভাষিণী মনে প্রাণে ওকে কৃতজ্ঞতা জানায়। যার শক্তির কাছে এতগুলো দস্যু পর্যন্ত পরাজিত হলো।

অন্ধকার ভেদ করে অশ্ব ছুটে চলেছে। অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী কালো পোশাকধারী আর সুভাষিণী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মনসাপুর জমিদার বাড়ি পৌছে গেল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখন পূর্ব আকাশে ভেসে উঠেছে।

জমিদার বাড়ির অদূরে একটা ঝোপের আড়ালে অশ্ব রেখে নেমে দাঁড়ালো অশ্বারোহী। তারপর সুভাষিণীকে অশ্ব থেকে নামিয়ে নিল সে। অশ্বারোহী বলেন—এবার আপনি বাড়ি যেতে পারবেন নিশ্চয়ই?

সুভাষিণী নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েছিল অশ্বারোহীর মুখের দিকে। চাদের আলোতে ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভুলে গেল সুভাষিণী জবাব দিতে।

অশ্বারোহী হেসে নিজের রুমালখানা বেঁধে নেয়। তারপরে বলে—ঐ আপনার বাড়ি দেখা যাচ্ছে , যান।

সুভাষিণী এবার জবাব দেয়—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ততক্ষণে অশ্বারোহী অশ্ব চড়ে বসেছে।

সুভাষিণী বলে ওঠে—একটি কথা, আপনার পরিচয়?

অশ্বারোহী প্যান্টের পকেট থেকে একটি কাগজের টুকরা বের করে সুভাষিণীর হাতে দিয়ে বলে—এতেই পাবেন আমার পরিচয়।

কিন্তু আবার কবে আপনার দেখা পাব?

ঈশ্বর না করুন আবার যদি এমন বিপদে পড়েন তখন... অশ্ব ছুটতে শুরু করেছে, শেষের কথার অংশগুলো আর শুনা যায় না!

অশ্বারোহী অদৃশ্য হতেই সুভাষিণী বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে। বাড়ির নিকটবর্তী হতেই দেখতে পায় তার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন মিলে জোট পাকিয়ে হুলস্থুল শুরু করছে।

মা কাঁদছেন, আরও অনেকে কাঁদছেন। কিছুসংখ্যক লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সুভাষিণী বুঝতে পারে, দস্যুকবল থেকে পালিয়ে এসে পাহারাদার তার পিতার নিকটে খবরটা জানিয়েছে, তাই এসব আয়োজন চলছে।

সুভাষিণীকে সুস্থ দেহে অক্ষত অবস্থায় অলঙ্কারপূর্ণ শরীরে ফিরে আসতে দেখে সবাই অবাক হলো। মা ছুটে এসে কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন। পিতা ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—মা, কি করে ফিরে এলি? কি করে ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেলি?

সুভাষিণী বলেন—সব বলছি, তোমরা ভিতরে এসো।

কন্যার সঙ্গে সবাই অন্দরবাড়িতে গিয়ে বসলো!

সুভাষিণী সব বলেন, কিন্তু কে যুবক এ এখনও জানে না। সকলের অজ্ঞাতে আলোর সামনে মেলে ধরলো কাগজের টুকরাখানা যার মধ্যে আছে তার অজ্ঞাতবন্ধুর পরিচয়। অতি সাবধানে খুলেন কাগজের টুকরাখানা। না জানি কোন রাজার ছেলে কিনা; কিংবা কোন দেবকুমার হবে সে কাগজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভয়ার্ত কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে সুভাষিণী—দস্যু বনহুর।

কতক্ষণ যে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো খেয়াল নেই ওর। যে দস্যু বনহুরের নামে গোটা দেশবাসীর আতঙ্কের সীমা নেই, যে দস্যুর নামে লোকের হৃদকম্প হয়, এ সে দস্যু বনহুর! সুভাষিণী একবার নয়, শত শত বার ঐ কাগজের টুকরাখানা ছিল।

❑

তাজের পদশব্দ চিনতো নূরী। ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছে, হঠাৎ অতি পরিচিত অশ্ব-পদশব্দ। নূরীর তন্দ্রা ছুটে গেল, দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াল, নূরী ছুটে এসে ওর হাত ধরলো—সত্যি হুর, আজ আমি তোমার জন্য খুব চিন্তিত ছিলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করতে পেরেছ?

বনহুর চলতে চলতে জবাব দেয়—খোদার অশেষ কৃপায় পেরেছি।

তাহলে রহমান তোমাকে একেবারে সঠিক খবরই দিয়েছিল, কি বল?

হ্যাঁ নূরী, খবরটা ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম বলেই মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারলাম। কিন্তু নূরী, ঐ শয়তান অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

হেসে বলে নূরী—তোমার কাছে শয়তানি কতক্ষণ টিকবে? দাও না যমালয়ে বিদায় করে।

হ্যাঁ নূরী, অচিরেই ওর সঙ্গে আমার একটা বুঝা-পড়া হবে। নাথুরামকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

নাথুরাম যে একজন দুর্দান্ত শয়তান জানে নূরী। মনে মনে শিউরে ওঠে সে। অজানা এক আশঙ্কায় দুলে ওঠে তার হৃদয়।

উভয়ে নীরবে এগুতে থাকে।

বনহুর বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে। নূরী ওর দেহ থেকে দস্যুর কালো ড্রেস খুলে নেয়। শয্যায় গিয়ে বসে বনহুর। হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের ললাটে। কপালের একপাশে কিছুটা অংশ কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আঁতকে ওঠে নূরী, একি হুর, তোমার ললাট কেটে গেছে। ইস... নূরী যত্নসহকারে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো।

বনহুর হেসে বলেন—ও এমন কিছু নয় নূরী। সেরে যাবে।

নূরী রাগত কণ্ঠে বলেন—তোমার ও কিছু নয়। ইস কতটা কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি ঔষধ এনে লাগিয়ে দেয় বনহুরের ললাটে তারপর অতি যত্নে বেধে দিতে থাকে কাপড় দিয়ে।

বনহুর নূরীর চিবুক ধরে উঁচু করে বলে—নূরী, আমার জন্য তোমার কত দরদ। কিন্তু আমি তো তোমার জন্য এতটুকু ভাববার সময় পাইনে!

এজন্য আমি দুঃখিত নই, হুর। আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস!

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে, এ বিশ্বাস যেন তোমার চিরদিন অটুট থাকে।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলের ফাকে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলে—হুর, মনে পড়ে সে ছোটবেলার কথা, তুমি আর আমি যখন এক সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতুম তুমি তীর ধনু দিয়ে পাখি শিকার করতে, আর আমি ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনতাম। তুমি খুশি হয়ে বলতে নূরী, কোনদিন তোকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না। মনে পড়ে সে কথা।

বনহুরের চোখের সামনে ছোটবেলার দৃশ্যগুলো ভেসে উঠে একের পর এক ছায়াছবির মত।

একদিনের দৃশ্য আজও বনহুরের মনে স্পষ্ট আঁকা আছে।

বনহুর আর নূরী ঝরনার পানিতে সাতার কাটছিল, হঠাৎ বেশি পানিতে পড়ে যায় নূরী। স্রোতের টানে বেসে যায় সে অনেকটা দূরে। বনহুর ভুলে যায় গোটা দুনিয়া, নূরী যে তার যথাসর্বস্ব নূরীকে হারালে তার চলবে না। নূরী ছাড়া বাঁচবে না বনহুর। নিজের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল বনহুর স্রোতের বুকে। অনেক কষ্টে নূরীকে সেদিন বাঁচাতে পেরেছিল সে। নূরীকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরে তার সেদিন কি আনন্দ! সব কথা আজ মনে পড়তে লাগলো বনহুরের।

বনহুর নূরীর হাতখানা তার নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বলে নূরী।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলাচ্ছিল, জবাব দেয়—বল। সত্যি তুমি কত সুন্দর!

হুর! অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে নূরী।

নূরী। আবেগভরা কণ্ঠ বনহুরের।

❑

সেদিন নৌকা ভ্রমণে মনিরার উপর হামলার কথাটা পুলিশ মহলে সাড়া জাগিয়েছিল, তাদের একমাত্র সন্দেহ এ কাজ দস্যু বনহুরের ছাড়া আর কারও নয়। কারণ বনহুর যে মনিরাকে ভালবাসে, এ কথা সবাই জেনে নিয়েছে। পুলিশ ইন্‌সপেকটার মিঃ হারুন এবং মিঃ রাও বসে এ বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলেন শঙ্কর রাও বলে উঠেন—ইন্‌সপেকটার, আপনার কি মনে হয় দস্যু বনহুরই মনিরার ওপর হামলা করেছিল?

হ্যাঁ, সে ছাড়া অন্য কেউ নয়। কারণ, মনিরাকে দস্যু বনহুর ভালবাসে, এ কথা একেবারে সত্য। পূর্বেও এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

শঙ্কর রাও বলে ওঠেন—তাহলে দস্যু বনহুরই তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ এবং সুস্থ অবস্থায় নিরাপদে তাকে পিতামাতার নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

পিতা-মাতা নয়, মামা-মামী।

সরি, হ্যাঁ মামা-মামীর পাশে ফিরে এসেছে মনিরা এবং দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কোন বদমাইশ তাকে এভাবে সসম্মানে ফেরত পাঠাত না নিশ্চয়ই। এতেই বুঝা যায় এ দস্যু বনহুরের কাজ।

এ সম্বন্ধে কি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেছিল?

করেছিলাম, কিন্তু সন্তোষজনক কিছু জানতে পারিনি।

রাও গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—ইন্‌সপেকটার, সত্যিই যদি দস্যু বনহুর মনিরাকে ভালবেসে থাকে তবে তাকে গ্রেফতারের একটা সুযোগ করে নিতে পারবো।

সেবার তাকে গ্রেফতারের সময় সো আমরা বিশেষভাবে জেনে নিয়েছি মিঃ রাও। আপনি সে পথ ধরেই এগুতে চেষ্টা করুন।

ঠিকই বলেছেন ইন্‌সপেকটার সাহেব, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে হলে ঐভাবেই এগুতে হবে এবং আমি আশা করি কৃতকার্য হবো।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও, আপনি এবার সফল হবেন বলে আমার মনে হচ্ছে।

শঙ্কর রাও এবার কিছুক্ষণ গালে হাত রেখে ভাবলেন। তারপর বলেন—ইন্‌সপেকটার, একটা প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে।

বলুন?

মনিরাও দস্যু বনহুরকে ভালবাসে, এ কথা আপনি জানেন?

আপনি কি বলতে চান দস্যু বনহুরের কোনই প্রয়োজন ছিল না মনিরাকে হানা দিয়ে চুরি করা, কারণ মনিরা স্বেচ্ছায় তার পাশে যেত।

সে কথা মিথ্যে নয়, ইন্‌সপেকটার সাহেব।

না, আপনি এবং আমি যা মনে করছি তা নাও হতে পারে। এক সময় হয়ত মনিরা তাকে ভালবাসতো, কিন্তু যখন তার আসল রূপ ধরা পড়েছে, যখন মনিরা জানতে পারল যাকে সে ভালবাসে সে স্বাভাবিক মানুষ নয়, সে দস্যু; তখন হয়তো তার মন ভেঙ্গে গিয়ে থাকতে পারে। ঘৃণা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

শঙ্কর রাও বলেন—তাহলে একটা কাজ করুন মিঃ হারুন, এতে আমার কিছুটা উপকার হবে, মানে কাজের সহায়তা হবে।

বলুন?

মিস মনিরাসহ তার মামা চৌধুরী সাহেবকে একবার এখানে আসতে বলুন। আমি তাদের মুখে এ ব্যাপারে কয়েকটা কথা শুনতে চাই।

বেশ, আমি এক্ষুণি ফোন করছি।

ধন্যবাদ।

মিঃ হারুন উঠে গিয়ে রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নিলেন—

হ্যালো?

ওপাশ থেকে ভেসে এলো চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠ—কে কথা বলছেন?

স্পিকিং মিঃ হারুন। হ্যাঁ, আমি পুলিশ অফিস থেকে বলছি। শুনুন মিঃ চৌধুরী, আপনি আপনার ভাগ্‌নী মিস মনিরাসহ দয়া করে যদি একটিবার আসেন! হ্যাঁ পুলিশ অফিসে...

চৌধুরী সাহেব বলেন—নিশ্চয়ই আমি আসছি ইন্সপেক্টর। আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি মা মনিরার কাছে জেনে নেই সে এখন আমার সঙ্গে আপনার ওখানে যেতে পারবে কিনা। কারণ, ওর এক বান্ধবীর ওখানে যাবার কথা আছে। রিসিভারের মুখে হাত রেখে ডাকেন চৌধুরী সাহেব—মনিরা, মা মনিরা, একটিবার এদিকে শুনো তো?

পাশের কক্ষ থেকে ভেসে আসে মনিরার কণ্ঠ—আসছি মামুজান।

অল্পক্ষণেই মনিরা এসে হাজির হয়—মামুজান আমায় ডাকছো?

হ্যাঁ মা, ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন বলছেন এক্ষুণি তোমাকে সঙ্গে করে যেতে। তাঁরা পুলিশ অফিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঠিক সে মুহূর্তে একটি দাঁড়িওয়ালা লোক কক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, চৌধুরী সাহেবের কথাগুলো কান পেতে শুনলো সে।

মনিরা মামুর কথায় জবাব দেয়—বেশ ভালই হলো, সেখান থেকে ফেরার পথে মাধুরীর বাড়ি হয়ে আসবো।

যাও মা, চট করে তৈরি হয়ে নাও তবে।

মনিরা বেরিয়ে যায়।

চৌধুরী সাহেব রিসিভারে মুখ রাখেন—হ্যালো, হ্যাঁ মনিরা যাবে। নিশ্চয় আসছি। থ্যাঙ্ক ইউ।

দাড়িওয়ালা লোকটি কক্ষে প্রবেশ না করে পিছু হটে বেরিয়ে গেল।

মনিরা চলে গেল নিজের কক্ষে।

অল্পক্ষণেই তৈরি হয়ে মনিরা মামুজানের পাশে এসে দাঁড়ায়। চৌধুরী সাহেব মনিরাকে লক্ষ্য করে বলেন—মা মনিরা, তোমার হয়ে গেছে দেখছি।

হ্যাঁ মামুজান, চলো।

গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব এবং মনিরা ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

চৌধুরী সাহেব আর মনিরা গাড়িতে উঠে বসে। ড্রাইভার ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই মিঃ হারুন নিজে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নামিয়ে নিলেন।

মিঃ হারুন হাত বাড়ালেন—হ্যালো চৌধুরী সাহেব, বিশেষ কয়েকটি কথার জন্য আপনাকে ডেকেছি। আসুন মিস্ মনিরা।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো, চৌধুরী সাহেব আর মনিরা নেমে অফিস রুমে প্রবেশ করলো।

অফিসরুমে প্রবেশ করতেই শঙ্কর রাও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ারে বসলেন তাঁরা।

মিঃ হারুন মনিরাকে জিজ্ঞেস করলেন—মিস মনিরা, আপনাকে একটু কষ্ট দেব। কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই?

বেশ করুন, এতে আমার কষ্ট কি! হেসে বলেন মনিরা।

মিঃ হারুন মনিরার দিকে একটু ঝুকে বসলেন, তারপর বলেন—মিস মনিরা, আপনাকে যে প্রশ্ন করা হবে আশা করি তার সঠিক জবাব পাব। আচ্ছা বলুন তো যেদিন আপনি আপনার বান্ধবীগণসহ নৌকা-ভ্রমণে যান, সেদিন মাঝিদের মধ্যে কোন সন্দেহজনক ভাব লক্ষ্য করেছিলেন কি?

না। কাউকে সন্দেহ হয় নি বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি।

হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যারা আপনার ওপর হামলা করেছিল তারা দস্যু বনহুরের দল?

মনিরা বলে ওঠে—এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, দস্যু বনহুর আমার ওপর হামলা করেনি।

শঙ্কর রাও বলে ওঠেন—আমি প্রথমেই অনুমান করেছিলাম, এ কাজ দস্যু বনহুরের নয়। নিশ্চয়ই এ অন্য একটি দল।

মিঃ হারুন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করেন, তারপর বলেন—আচ্ছা মিস মনিরা আপনাকে যে মাঝি দস্যুদল থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন কি?

না, তাকে আমি কোনদিন দেখিনি। কিন্তু সে ব্যক্তি অত্যন্ত মহৎ এবং তার দয়াতেই আমি দস্যুর হাত থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয়েছি। মনিরা বনহুরের নাম গোপন করে বলল।

মিস মনিরা, সে লোকটি যদি সত্যই মহৎজন হবে, তাহলে সে কখনও দস্যুদলে যোগ দিত না।

চৌধুরী সাহেব বলেন—অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অভাবের তাড়নায় মানুষ অনেক জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়।

হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়। বলেন মিঃ রাও।

আরও কিছুক্ষণ মনিরাকে নানা প্রশ্ন করেও সন্তোষজনক কিছু জানতে পারেন না তাঁরা।

মিঃ হারুন এবার চৌধুরী সাহেবকে বলেন—চৌধুরী সাহেব, আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, দস্যু বনহুর আপনার পুত্র জেনেও আমরা তাকে রেহাই দিতে পারছিনে।

চৌধুরী সাহেবের মনে যত ব্যথাই থাক গোপনে চেপে বলেন তিনি—সে দোষী, কাজেই আইনের চোখে সে অপরাধী। আমার পুত্র হলেও সে ক্ষমার পাত্র নয়।

থ্যাঙ্ক ইউ চৌধুরী সাহেব, এটাই হচ্ছে সত্য কথা। অপরাধী যতই স্নেহের পাত্র হউক, তাকে ক্ষমা করা চলে না। বলেন শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন বলেন—হ্যাঁ, এবার আসল কথা বলি চৌধুরী সাহেব।

বলুন?

দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার হতে পালিয়েছে এ কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

হ্যাঁ জানি।

যদিও আপনি তার পিতা, তবু আপনার কর্তব্য তাকে ধরিয়ে দেওয়া।

একটা ঢোক গিলে বলেন চৌধুরী সাহেব—হ্যাঁ।

এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য পাব।

চৌধুরী সাহেব একটু থেমে বলেন—হ্যাঁ পাবেন।

এমন সময় ড্রাইভার একখানা কাগজ এনে মনিরার হাতে দেয়—আপামণি আপনার যে কোন বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা ছিল সে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছে।

মনিরা কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাজ খুলে মেলে ধরলো চোখের সামনে। মুহূর্তে মনিরার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে ওঠে। কাগজে লেখা আছে "মনিরা, আমি তোমার জন্য লেকের ধারে অপেক্ষা করছি"—বনহুর।

মনিরা কাগজখানা ভাজ করে বলে ওঠে—মামুজান, আমার বান্ধবী এক্ষুণি আমাকে যেতে বলেছে, না গেলেই নয়। উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

চৌধুরী সাহেবও বলে ওঠেন—আমিও তাহলে চলি ইন্‌সপেক্‌টার সাহেব।

মিঃ হারুন বলেন—আপনার সঙ্গে আরও কিছু আলাপ আছে চৌধুরী সাহেব। মিস মনিরা, আপনি যেতে পারেন। আপনার মামুজানকে আমাদের অফিসের গাড়ি পৌঁছে দেবে।

চৌধুরী সাহেব ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলেন—ড্রাইভার, মনিরাকে সাবধানে নিয়ে যেও এবং হুশিয়ার থেক।

ড্রাইভার দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

মনিরা প্রফুল্ল চিত্তে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

মনিরা উঠে বসে বলে—লেকের ধারে চল।

বহুৎ আচ্ছা আপামণি। কথাটা বলে গাড়িতে স্টার্ট দেয় ড্রাইভার। গাড়ি উল্‌কাবেগে ছুটতে শুরু করে।

একি! গাড়ি যে লেকের পথে না গিয়ে অন্য পথে মোড় ফিরল। মনিরা শিউরে উঠলো, তীব্রকণ্ঠে বলেন—ড্রাইভার, কোথায় যাচ্ছ।

ড্রাইভার আসন থেকে বলে ওঠে—আপামণি, ও পথ বহুৎ খারাপ আছে। ইধার বাঁকা পথে যেতে হবে।

মনিরা চুপ করে রইলো, ড্রাইভার তাদের নতুন লোক নয়, তাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। কারণ সে জন্মাবধি এই শিখ ড্রাইভারকে দেখে আসছে। ওর কোলে কাঁধেই মানুষ হয়েছে মনিরা।

কিন্তু একি! লেকের ধারে না গিয়ে একেবারে নির্জন নদীতীরে এসে গাড়ি থেমে ছিল। ড্রাইভার আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো—আসুন আপামণি!

মনিরা রাগে গজ গজ করে বলে—ড্রাইভার, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে? এটাই বুঝি লেকের ধার?

হঠাৎ ড্রাইভার হেসে ওঠে— হাঃ হাঃ হাঃ মনিরা এখনও তুমি আমাকে চিনতে পারনি?

কে। কে তুমি?

নেমে এসো বলছি।

না, আমি কিছুতেই নামবো না। নিশ্চয়ই তুমি সে শয়তান, নৌকায় তুমি আমাকে চুরি করে...

হ্যাঁ আমিই সে, যাকে তুমি—ড্রাইভার মনিরার হাত ধরে ফেলে।

মনিরা তীব্রকণ্ঠে বলে—যাকে আমি ঘৃণা করি। শয়তান! এখনও তুমি আমার পিছু লেগে রয়েছ?

হ্যাঁ, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। নেমে এসো। যদি তোমার মঙ্গল চাও তবে নেমে এসো।

নির্জন নদী তীর একটি প্রাণী ও নেই আশেপাশে। মনিরার প্রাণ কেঁপে ওঠে। বার বার কত বার বনহুর তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে, এবার আর তার রক্ষা নেই। তবু দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে বলে সে—শয়তান আমি গাড়ি থেকে নামবো না।

ড্রাইভার মনিরার হাত চেপে ধরে—তোমাকে নামতে হবে। বলেই মনিরার হাত ধরে টেনে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলে।

মনিরার চোখেমুখে অসহায়ের চাহনি। আজ আর তার রক্ষা নেই। কেন সে ঐ চিঠিখানা বিশ্বাস করলো? কেন সে ড্রাইভারকে বিশ্বাস করলো? কেন তার সঙ্গে একা এলো?

ড্রাইভারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো সে। কিন্তু ড্রাইভারের বলিষ্ঠ হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতখানা মুক্ত করে নিতে পারলো না।

ড্রাইভার মনিরাকে নিবিড়ভাবে টেনে নিল কাছে।

মনিরা সে মুহূর্তে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল ড্রাইভারের গালে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের গাল থেকে তার নকল দাড়ি আর গোঁফ খসে ছিল। মনিরা বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—মনির তুমি!

ড্রাইভারের ছদ্মবেশী দস্যু বনহুর হেসে বলেন—হ্যাঁ আমি। এই বুঝি তোমার সাবধানে চলাফেরা, না?

মনির, আমি ভাবতেও পারিনি শিখ ড্রাইভারের বেশে তুমি! সত্যি তোমার চিঠি পেয়ে আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু যেখানেই যাও, সাবধানে যেও! আমার নামে অন্য কোন দুষ্ট লোকও তো চিঠি লিখতে পারতো।

সত্যি আমি বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বুকটা এখনও টিপ টিপ করছে।

এখন?

সব ভয় আমার দূর হয়ে গেছে।

চলো নদীর ধারে গিয়ে বসি। বনহুর কথাটা বলে এগুতে থাকে। মনিরা চলে তার পাশে পাশে।

নদীর কিনারে গিয়ে বসে ওরা।

মনিরা বনহুরের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলে—আজ কতদিন আসনি কেন বল তো?

কত কাজ আমার।

মনির, এখনও তুমি মানুষ হলে না। পুলিশমহলে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে সাড়া পরে গেছে, তোমাকে জীবিত কি বা মৃত এনে দিতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

জানি মনিরা, সব জানি। কিন্তু আমি তো সব সময় সকলের সামনেই বিচরণ করে বেড়াচ্ছি, ওরা কেন আমাকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় না?

মনির, ও কথা বল না। খোদা তোমাকে রক্ষা করুন। মনির, হাঙ্গেরী কারাগার তোমাকে আটকে রাখতে পরেনি, আর কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবেও না।

মনিরা!

সত্যি তুমি কত বড়! কত সুন্দর কত মহৎ....

অবশ্য তোমার কাছে। আচ্ছা মনিরা, তোমার যে বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা ছিল?

হ্যাঁ, মাধুরীর ওখানে, কিন্তু যাব না।

মাধুরী!

হ্যাঁ, মাধুরী, আমার এক পুরানো বান্ধবী। বড় অসহায় বেচারী...

কেন, কি হয়েছে তার? প্রশ্ন করে বনহুর।

সে এক অদ্ভুত ঘটনা। থাক, তোমার শুনে কাজ নেই।

না মনিরা বলতে হবে, তোমার বান্ধবী যখন সে, তখন আমারও বান্ধবী নিশ্চয়ই।

তবে শুন।

বল।

মাধুরীর বিয়ে হয়েছে কিন্তু ওর স্বামীকে সে একদিনের জন্যও পায়নি।

তার মানে?

বলছি শুন—তারপর মাধুরীর মুখে শুনা গল্পটা মনিরা সম্পূর্ণ খুলে বলে বনহুরের নিকটে।

স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনে যায় বনহুর। মনের মধ্যে তখন তার প্রচণ্ড ঝড় বেয়ে চলেছে। মাধুরী, যার সঙ্গে তার একটি রাতের পরিচয়!

মনিরা বলে চলেছে—সত্যি মনি, মাধুরীর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে...

বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে মাধুরীর ব্যথাভরা করুণ মুখখানা।

বনহুরকে চিন্তিত দেখে বলে মনিরা—কি ভাবছো মনির হঠাৎ তোমার কি হলো বলতো?

বনহুর গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় জবাব দেয়—উঁ।

কি ভাবছো?

ভাবছি তোমার সে বান্ধবীর কথা।

হ্যাঁ, ওর জন্য সত্যি বড় দুঃখ হয়। জান মনির, মাধুরী বলেছে, যে লোকটি ওর স্বামীর পরিচয় দিয়ে ওর কক্ষে রাত যাপন করে গেছে সে নাকি দেবতার চেয়েও মহৎ!

তাই নাকি?

হ্যাঁ দেখতেও সে নাকি অপূর্ব, মাধুরী বলে—জীবনে সে ওকে ভুলতে পারবে না কোনদিন। যতক্ষণ সে তার কথা বলেছিল কেমন যেন অভিভূতের মত বলে চলেছিল—সে সত্যি। মাধুরী ওকে ভালবেসে ফেলেছে...

বনহুর বলে ওঠে—থাক মনিরা ও সব কথা, এবার চলো ফেরা যাক, কেমন?

কিন্তু আমার যে ফিরতে ইচ্ছে করছে না মনির!

হেসে বলে বনহুর—বসলে ক্ষতি ছিল না মনিরা কিন্তু তোমাদের মোটর গ্যারেজের মধ্যে তোমাদের শিখ ড্রাইভার বেচারা ধুঁকে মরছে। মনিরা গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে—ওমা তাই নাকি! হ্যাঁ তার হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখে এসেছি।

সর্বনাশ!

তা নাহলে এই দিনের আলোয় তোমাকে পেতাম কি করে?

মনিরা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এত বুদ্ধি তোমার! চলো তবে।

চলো।

বনহুর আর মনিরা গাড়ির দিকে এগোয়।

মাধুরীর স্বামী নিমাই বাবুর কক্ষ।

নিজের ঘরে শুয়ে একটা বই পড়ছিল সে, রাত একটা দেড়টা হবে। নিমাইয়ের মনে নানা দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে। চোখে ঘুম নেই, তাই একটা বই নিয়ে তাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল।

বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়াও বইছে। গোটা বিশ্ব অন্ধকার। আজ নিমাইয়ের মনে মাধুরীর কথাই জাগছিল। এমন দিনে স্ত্রীকে কাছে পেতে কার না মন চায়। কিন্তু নিমাই ওকে গ্রহণ করতে পারে না। একটা সন্দেহের দোলা তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বই রেখে আলোটা কমিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিমাই, জানালাটা বন্ধ করে শোবে, ঠিক সে মুহূর্তে জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছিল একটি কালো মূর্তি। হাতে তার উদ্যত রিভলভার নিমাই যেমনি চিৎকার করতে যাবে, অমনি কালো মূর্তি রিভলভার চেপে ধরলো ওর বুকে—খবরদার!

নিমাই ঢোক গিলে বলে—কে তুমি!

ছায়ামূর্তি চাপাকণ্ঠে গর্জে ওঠে—দস্যু বনহুর!

ভয়ার্তকণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করলো নিমাই—দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ।

তুমি —তুমিই আমার স্ত্রীর কক্ষে....

হ্যাঁ আমিই, কিন্তু নিমাই বাবু আপনার স্ত্রী মাধুরীর কি অপরাধ?

নিমাই ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে—তুমিই তো তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছ শয়তান!

বনহুর দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলো নিমাইয়ের গলা—শয়তান আমি নই তুমি, মিথ্যা সন্দেহে নিজের স্ত্রীকে যে ত্যাগ করতে পারে, সে শয়তানের বড় শয়তান!

নিমাই যন্ত্রণায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে—উঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার গলা! নিমাইয়ের চোখ দুটো বেরিয়ে আসে। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

বনহুর বলে—আগে বল তোমার স্ত্রীকে আর অবিশ্বাস করবে না? গলা ছেড়ে দেয় বনহুর।

নিমাই গলায় হাতবুলিয়ে বলে—কেমন করে তাকে আমি বিশ্বাস করবো?

দস্যু বনহুর কোনদিন মিথ্যা বলে না। তোমার স্ত্রী অতি পবিত্র, নির্মল। তাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার।

নিমাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের রুমাল বাধা মুখের দিকে।

বনহুর নিজের মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলে।

নিমাই কল্পনাও করতে পারেনি দস্যু বনহুরের চেহারা এত সুন্দর হবে, মুহূর্তে ওর মন থেকে ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়। বনহুরের স্বর্গীয় দ্বীপ্তিময় দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আর অবিশ্বাস করতে পারে না। তাকিয়ে থাকে নির্বাক নয়নে।

হেসে বলে বনহুর—আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে। .

অস্ফুট কণ্ঠে বলেন নিমাই—হ্যাঁ।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে কালই তুমি মাধুরীর হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে ওকে নিয়ে এসো। যদি এর অন্যথা হয় তবে মনে রেখ—হাতের রিভলভারটা উদ্যত করে ধরে—এর একটা গুলি তোমাকে হজম করতে হবে।

ভয়ার্ত চোখে নিমাই একবার বনহুরের মুখে আর একবার তার হাতে রিভলভারটার দিকে তাকায়।

বনহুর তাকে ভাবার সময় না দিয়ে এক লাফে মুক্ত জানালা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

❑

সুভাষিণী সেদিনের পর থেকে কেমন যেন ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। তার মুখের হাসি কোথায় যে মিলিয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই। সখীরা তাকে এমন বিষণ্ন ভাবাপন্ন হয়ে পড়তে দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পিতামাতাও উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন, তাদের একমাত্র কন্যার হলো কি? বড় বড় ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, কিন্তু কোন ডাক্তারই রোগ খুঁজে পাচ্ছে না। সুভাষিণীর মুখে তবু হাসি নেই। ঠিকভাবে নাওয়া খাওয়া নেই। সখীদের নিয়ে হাসি গল্প নেই, সদা সর্বদা কি যেন ভাবে সে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়—কিছু হয় নি আমার।

একদিন সখীরা ধরে বসলো—সুভাষিণী, আজ তোকে বলতেই হবে, সে দিনের পর থেকে তোর কি হয়েছে? ডাক্তার বলেছে অসুখ নেই। নিজেও বলিস কিছু হয়নি, তবে তোর হলো কি?

সুভাষিণী কারো কাছেই বলতে পারে না তার মনের কথা। সে একজন দস্যুকে ভালবেসে ফেলেছে তবু সে স্বজাতি নয় মুসলমান কিন্তু তার পক্ষে ওকে ভুলাও অসম্ভব। কেন—কেন তার।

মনে ওর প্রতিচ্ছবি এমন করে গেঁথে গেছে? সে তো সভ্য সমাজের কোন লোক নয়। সে একজন দস্যু।

সুভাষিণীকে নীরব থাকতে দেখে সখীদের একজন বলে ওঠে—কি ভাবছিস সুভা?

ভাবছি তোরা আমার মাথাটা খাবি।

সত্যি তুই আমাদের প্রশ্নের জবাব দিবি না?

না।

বেশ, আজ থেকে আমরা তোকে বিরক্ত করব না। কিন্তু মনে রাখিস সুভা, তুই না বললেও আমরা বুঝতে পেরেছি, একটা কিছু তোর হয়েছে।

সেটুকুই জেনে রাখ তোরা, তাহলেই হলো।

একদিন সুভাষিণী বাগানে বসে ভাবছে এমন সময় তার বড় দাদার বৌ চন্দ্রা দেবী এসে বসলো তার পাশে।

সুভাষিণী ফিরে তাকিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলো কোন কথা বলেন না। পূর্বে যে বৌদিকে দেখে তার খুশির অন্ত থাকে না আজ আর সঙ্গে কথাই বলে না সুভাষিণী। চন্দ্রা ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেন, তারপর সুভাষিণীর একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে বলেন—সুভা, আজ তোকে একটা কথা আমাকে বলতে হবে। বল বলবি?

স্থিরকণ্ঠে বলে সুভাষিণী বলার মত হলে, নিশ্চয়ই বলবো।

আচ্ছা সুভা, তুই যে বলেছিলি কে যেন তোকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে বাড়ি পৌছে দিয়েছিল?

হ্যাঁ সে এক ভদ্রলোক।

সুভা, এবার আমি বুঝতে পেরেছি, সে দিন ঐ ভদ্রলোক তোকে বাঁচিয়ে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু তোর হৃদয় চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

যাও, ঠাট্টা করো না বৌদি।

ঠাট্টা নয় সুভা, এতদিন ঘরে সদা সর্বদা তোর বিষয় নিয়ে ভেবে দেখেছি ঠিক, এই রকম কিছু একটা হয়েছে। দেখ সুভা আমি তোর বৌদি। লক্ষ্মী বোনটি আমার কাছে কোন কথা লুকোতে নেই।

জানি, কিন্তু বলে কোন লাভ হবে না বৌদি।

হবে, আমাকে বললে অনেক উপকার হবে তোর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সুভাষিণী—তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো এ কথা কার কাছে বলবে না, তবে বলতে পারি।

বল, বলবো না।

বৌদি, তুমি যা অনুমান করেছো। তাই সত্য। যে সেদিন আমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সে আমার গোটা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারছিনে বৌদি।

সুভাষিণী, এ কথা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তার কোন পরিচয় জানা নেই—কে সে? কি তার নাম? সুভা, অজ্ঞাত একজনকে হঠাৎ এভাবে ভালবেসে, তুই ভুল করেছিস।

বৌদি, তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কে সে?

বৌদি, তুমি শুনলে চমকে উঠবে, ভয়ে শিউরে উঠবে। আমাকে রক্ষাকারী সে লোকটি স্বাভাবিক লোক নয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, দস্যু বনহুর।

বিস্ময়ভরা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে। চন্দ্রা—দস্যু বনহুর!

বৌদি, প্রথমেই বলেছি, এ কথা তুমি কাউকে বলবে না।

সুভা, একি বলছিস তুই।

বৌদি, আমি গোটা অন্তর দিয়ে ওকে ভালবেসে ফেলেছি।

সুভা, একটা দস্যু , একটা কুৎসিত জঘন্য ব্যক্তিকে...

না, না, বৌদি, তুমি তাকে জানো না বৌদি, তুমি তাকে জান না। বৌদি! একটি বার যদি তুমি তাকে দেখতে। দস্যু বনহুর সে মানুষ নয়—দেবতা!

এসব কি বলছিস সুভাষিণী?

তোমাকে কি বলবো, বৌদি। আমি কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছিনে। সুভাষিণী চন্দ্রার হাত চেপে ধরে—বৌদি, বলো কি করবো আমি?

চন্দ্রার মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবে। তারপর বলে—সুভা, যাকে কোনদিন আর দেখার সুযোগ পর্যন্ত পাবি না, তাকে ভালবেসে নিজেকে বিসর্জন দিসনে।

সুভাষিণী চন্দ্রার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বৌদি! বৌদি।

চন্দ্র সস্নেহে সুভাষিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

❑

হাঙ্গেরী কারাগার পরিদর্শন করার পর পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ স্বয়ং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন অন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারসহ গোপনে মিঃ চৌধুরীর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছেন। সবাই আড়ালে থেকে লক্ষ্য করছেন। তাঁরা গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেয়েছেন, দস্যু বনহুর হঠাৎ কোন কোন দিন চৌধুরী বাড়িতে আগমন করে এবং মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

বেশ কয়েক রাত এভাবে তারা গোপনে পাহারা চালিয়ে চলেছে। ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছেন মিঃ আহমদ। দস্যু বনহুরের দেখা পাওয়াতে দূরের কথা, একটি প্রাণীও দেখতে পাননি তারা রাতের অন্ধকারে।

আজ অমাবস্যা। গোটা পৃথিবী অন্ধকার। এই রাতের প্রতীক্ষায় আছে মনিরা। প্রতি অমাবস্যা রাতেই বনহুর আসতো তার কাছে। আজও আসবে সে।

ওদিকে গুলিভরা রাইফেল আর রিভলভার নিয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিশ বাহিনী। মিঃ আহমদের চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। আর জ্বলছে তার হাতের রিভলভারটি।

গভীর রাত। মনিরা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে । আজ আসবে মনিরা। বার বার ওর ছবিখানা নিয়ে দেখছে সে। ফুলের একটি মালা সুন্দর করে গেঁথে রেখেছে, এই মালাখানা পরিয়ে দিয়ে ওকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে মনিরা।

এমন সময় দূরে শুনা যায় অশ্বপদশব্দ।

মনিরার হৃদয়ে দোলা লাগে। মালাটা হাতে তুলে নিয়ে প্রতীক্ষা করে সে। বুকের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি নাড়া দিয়ে চলেছে।

মিঃ আহমদের দলবলের কানেও গিয়ে পৌঁছলো এই অশ্বপদ শব্দ। প্রত্যেকেই রিভলভার আর রাইফেল উদ্যত করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অশ্বপদশব্দ ক্রমে স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে।

ওদিকে মনিরার হাতে ফুলের মালা—

আর এদিকে পুলিশ বাহিনীর হাতে উদ্যত রিভলভার...

হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে তাজের পিঠে এগিয়ে আসছে দস্যু বনহুর।

পরবর্তী বই
সৈনিক বেশে দস্যু বনহুর

এ, এইচ, এম, মুহিত
বই লাভারস পোলাপান